জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কথা



নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

CR

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কথা

(নানা সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক রচনা)

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষতের নব নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুসারে
সপ্তম শ্রেণীর সহায়ক পাঠ

২৭৫

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ইউ. এন. ধর. অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রকাশক ঃ

শ্রীদ্বীজেন্দ্রনাথ ধর

ইউ. এন. ধর অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীউমেশচন্দ্র মিত্র

মুদ্রন

৯/১, নরসিং লেন, কলিকাতা ৯

সূচীপত্র

মুদ্রণ-ত্রুটি

পৃষ্ঠা ৬ঃ

ষষ্ঠ লাইনের পর বসবে—

'মতো পোশাকও নেই, ওদের মতো

দামী গয়নাও নেই, আর তার ওপর'

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কথা

তুমি হও

নব-বর্ষে প্রার্থনা করি, হে বন্ধু, তুমি বীর হও!

যেমন বীর ছিলেন সীজার, তেমন নয়; যেমন বীর ছিলেন চেঙ্গিস খাঁ, তেমন নয়; যেমন ছিলেন বীর সেকেন্দার শাহ, তেমন নয়!

সীজার-সেকেন্দারের চেয়ে আমি যাদের বড় বীরপুরুষ বলে মনে করি, তাদের হাতে কোন তরবারি নেই···তাদের পেছনে কোন বিজয়-বাহিনী নেই!

আমার বীরেরা নব নব রাজ্য জয় করেছেন, কিন্তু কাউকেই রাজ্যহারা করেন-নি। মানুষের রক্তে পথের ধুলোয় কাদার সৃষ্টি করে আমার বীরের বিজয়-শকট চলে না।

আমার আমুনডসেন জরাজীর্ণ বৃদ্ধবয়সে জনহীন পথহীন মরুতে যান···হারিয়ে-হাওয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুঁজে বা'র করতে!

নির্জন মরুদেশ! চারজন মেরুযাত্রী দক্ষিণ-মেরু-আবিষ্কার করে ফিরছেন। ফিরবার পথে হঠাৎ কোথা থেকে এল, তুমুল তুষার-ঝড়, ব্লিজার্ড। পথ গেল হারিয়ে। সেইখানেই তাঁরা কোন রকমে তাঁবু ফেললেন।

দিনের পর দিন যায়, ঝড় আর থামে না। তুষারে তাঁবু ডুবে যাবার উপক্রম হ'ল। দু'জন সঙ্গীকে মৃত্যু নিল টেনে। বাকি রইল ক্যাপটেন স্কট এবং ওটস। খাবার নেই আর। মাত্র একজনের

হু'বেলার মত খাবার আছে। গভীর রাত্রিতে কাউকে কিছু না বলে ওটস সেই ব্লিজার্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, শুধু স্কটকে লিখে গেলেন, বন্ধু, আমার খাবারের অংশটা থেকে তুমি অন্তত আরও একবেলা টিকে থাকতে পারবে! বিদায়!

আমার বীর মৃত্যু দিয়ে আনে অমৃত! তার তনুত্যাগে পৃথিবী হয়েছে স্বর্গ!

ইয়লো ফিভার, যার নাম শুনলে, সারা পৃথিবী শঙ্কিত হয়ে উঠত, সেই জ্বরের আক্রমণে লাখে লাখে লোক অসহায় অবস্থায় একদিন মরেছে। কি এ অসুখ? কেমন করে হয়? কি করেই বা এর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারা যায়?

অনেকের ধারণা, এই রোগের বীজাণু মশার কামড়ে এক দেহ থেকে আর এক দেহে সংক্রামিত হয়ে যায়। কিন্তু তার প্রমাণ?

এই অসুখের রক্ত বেশ করে একদল মশাকে খাওয়ান হ'ল। কিন্তু পরীক্ষা হবে কার দেহে? জেনে-শুনে কে নেবে এমনভাবে মৃত্যুকে বরণ করে?

এগিয়ে এল আমার বীর, ডাঃ ল্যাজিয়ার। তিনি নিজে তাঁর দেহে সেই মশার কামড় নিলেন। দেখতে দেখতে সেই মারাত্মক রোগ তাঁর দেখা দিল; এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন।

কিন্তু এই মারাত্মক ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করবার পথ তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেলেন।

আজ সেই আত্মদানের ফলে জগৎ এই কাল ব্যাধির হাত থেকে বাঁচবার উপায় খুঁজে পেয়েছে!

আমার বীর কলিঙ্গ-জয়ী অশোক নয়। আমার বীর প্রিয়দর্শী ভিক্ষুক অশোক, যিনি পাহাড়ের গায়ে লিখে রেখে গিয়েছেন, বীরত্ব নরহত্যায় নয়,—বীরত্ব বিশ্বমানবের কল্যাণ-সাধনে!

প্রার্থনা করি, হে বন্ধু, তুমি হও এঁদেরই মত বীর।

* *
*

নব-বর্ষে প্রার্থনা করি, হে বন্ধু, তুমি ধীর হও! যেমন ধীর তৃণ, তেমন নয়; যেমন ধীর স্থাণু পাহাড়, তেমন নয়; যেমন ধীর শবদেহ, তেমন নয়। তারা ধীর বটে কিন্তু গতিহীন অচল।

আমার ধীরত্ব হ'ল নিস্তব্ধ উষার মত···সে নিস্তব্ধ, কেননা তারই বুকে রয়েছে দিবসের প্রাণ, প্রভাতের সূর্য। সে হ'ল অচপল দীপ-শিখার মত···সে শুধু আছে, এইটুকু তার পরিচয় নয়, সে আছে, তাই আলো আছে।

তখন সবেমাত্র সূর্য উঠেছে। ফ্রান্সের এক গ্রামে এক বন-পথের ধারে মাটির দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে এক বুড়ো বসে আছে। পাশ দিয়ে গাঁয়ের মজুরেরা শহরে যায় কাজ করতে।

সন্ধ্যেবেলা তারা আবার যখন ঘরে ফেরে, দেখে, বুড়ো ঠিক সেইখানে সেইভাবে বসে আছে! বুড়োর অবস্থা দেখে তারা বলে, আহা, পাগল হবে!

এই পাগলের নাম হ'ল, ফেবার। কীট-পতঙ্গের মন আছে কিনা তিনি পরীক্ষা করছিলেন এবং তাঁরই সেই ধীর সাধনার ফলে আজ আমরা কীট-পতঙ্গের জগতের খবর জানতে পেরেছি।

কুড়ি বছর, দিনের পর দিন, অসাধ্য পরিশ্রম করে স্যার আইজাক নিউটন অঙ্ক সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্ত একটির পর একটি কষে বা'র করেছেন। একদিন হঠাৎ বাতির আলো পড়ে, সেই সমস্ত কাগজ পুড়ে গেল।

তখন নিউটন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁর সহযোগী কয়েকজন ছাত্র এসে দেখে, কি সর্বনাশ, সমস্ত কাগজপত্র পুড়ে গিয়েছে! কুড়ি বছর সাধনার ফলে দুরূহ অঙ্কের সমাধান বা'র করা হয়েছিল, সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে! তারা ত ভেবেই অস্থির, কি করে নিউটনকে এ খবর তারা দেবে...হয়ত নিউটন শুনে পাগল হয়ে যাবেন।

কিন্তু নিউটন বাড়ী ফিরে সমস্ত ধীরভাবে শুনলেন। শুধু বললেন, কি আর হবে? আবার সব কষে বা'র করতে হবে।

এবং তাই করলেন।

তাই প্রার্থনা করি, যে বন্ধু, তুমি ধীর হও, অচল নুড়ির মত নয়, নিষ্কম্প দীপ-শিখার মত!

* *

*

নব-বর্ষে প্রার্থনা করি, হে বন্ধু, তুমি সুন্দর হও। পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর, যেন তোমাকে আনন্দ দেয়, শক্তি দেয়...যেমন সুখাদ্য দেয়, আমাদের শরীরে আনন্দ আর শক্তি।

তুমি সুন্দর হও, সিল্ক পরে নয়, তুমি সুন্দর হও, চন্দন মেখে নয়। সিল্ক দু'দিনে ময়লা হয়ে যায়, চন্দন দু-এক ঘন্টায় শুকিয়ে যায়। আমার সুন্দরের যা আবরণ, তা কি এত সহজে নষ্ট হয়ে যায়?

সেবার উড়িষ্যায় নিদারুণ দুর্ভিক্ষ হয়েছে। মানুষ খেতে না পেয়ে

মাঠের ঘাস চিবিয়ে খেয়েছে, অসহায়ভাবে ঘরে ঘরে লোক মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে।

সনাতনের ঘরে, সনাতন, তার বিধবা মা আর তিনটি ছোট ছোট ভাইবোন। সনাতনেরই বা বয়স কত? মাত্র চোদ্দ বছরের ছেলে। আজ চার দিন ধরে কোথাও তারা মুখে দেবার মত কিছু খাদ্য খুঁজে পায় নি। কচি তিনটি ছেলে একেবারে অবশ হয়ে পড়ে গিয়েছে।

সনাতন প্রতিজ্ঞা করে বেরুল, যেমন করে হোক, সে কিছু খাদ্য মুমূর্ষু ভাই-বোনদের জন্যে নিয়ে আসবে! তারও চারদিন কিছু খাওয়া নেই। সমস্ত দিন সে চলেছে, কোথায় পাবে খাদ্য? ক্ষিদেয় সে আর চলতে পারে না।

তখন তার মনে হচ্ছিল যে, পথের পাথর চিবিয়ে খায়! এমন সময় সৌভাগ্যক্রমে কয়েক মুঠো ভাত জুটল। সনাতনের সর্বদেহ বলে উঠল, সনাতন ঐ ভাত ক'টা আগে তোমার পেটে দাও!

কিন্তু সনাতন তা পারলে না। কাপড়ের খোঁটে করে সে ভাতগুলো বেঁধে বাড়ীর দিকে চলল।

পা আর চলে না। অবশ হয়ে সে পথে বসে পড়ল। ক্রমশ তার সর্বদেহ অসাড় হয়ে এল।

সকালবেলা দুর্ভিক্ষ-নিবারণী দলের লোকেরা এসে দেখে, সনাতন পথের ধারে মরে পড়ে আছে। কিন্তু কি আশ্চর্যের ব্যাপার, তারই বুকের ওপর খোঁটে বাঁধা ভাত রয়েছে!

ভাই-বোনদের কাতর মুখ মনে করে, একটি দানাও সে তার মুখে দিতে পারে নি!

সে ছিল সত্যই সুন্দর! আমার সুন্দরের আয়োজন বড় কম।

মহারাজ বিন্দুসার তাঁর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বিচারককে ডেকে বললেন, আপনাকে বলে দিতে হবে, আমার ছেলেদের মধ্যে কে সুন্দরতম, কে যোগ্যতম ?

বিচারের দিন বিভিন্ন মহিষীর ছেলেরা নানা রকম পোষাক পরে এল। কিন্তু অশোক ছিলেন, অত্যন্ত কুৎসিত দেখতে। তিনি দুঃখিত হয়ে বললেন, মা আমি আর কেন যাব সে-সভায় ? আমার ওদের আমাকে কি কুৎসিতই না দেখতে !

তবুও মার কথায় অশোকও এলেন। মা নিজের হাতে একখানা ফরসা কাপড় পরিয়ে দিলেন। সাধারণ একখানা কাপড়। সভায় এসে দেখেন, অন্য সব রাজকুমারেরা দামী দামী পোষাকে সজ্জিত হয়ে কারুকার্যময় মূল্যবান আসনে বসেছে। অশোক একধারে মাটিতে বসে পড়লেন।

বিচারক এসে বললেন, রাজকুমারদের যাঁর আসন এবং বসন সুন্দরতম, তিনিই সুন্দরতম !

কার আসন আর বসন সুন্দরতম ?

রাজকুমার অশোকের !

মাতৃদত্ত শুভ্রবসনের চেয়ে সুন্দরতম বসন আর নেই, ধরণীর চেয়ে সুন্দরতম আসন আর নেই। অন্য রাজকুমারদের সমস্ত আয়োজন আর আড়ম্বর হয়ে গেল ব্যর্থ !

তাই তোমাকে বলি, ওগো বন্ধু, আমার সুন্দরের আয়োজন বড় কম।

আজ নব-বর্ষে, বন্ধু, তাই আবার বলি, তুমি সুন্দর হও, সিল্কে নয়, চন্দনে নয়, অন্তরের আনন্দ-কান্তিতে।

—০—

দুই মহাদেশের বিচ্ছেদ ও মিলন

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, হাজার হাজার বছর আগে য়ুরোপ আর আমেরিকা সংযুক্ত ছিল।

সে অবশ্য পৃথিবীতে মানুষ আসবার হাজার হাজার বছর আগের কথা। তখন বন্য-পশুরা পায়ে হেঁটে এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে যেতে পারত।

যখন মানুষ পৃথিবীতে এল, তখন এই দুই মহাদেশের মধ্যে প্রকৃতি বিরাট ব্যবধান তৈরী করে দিয়েছে।

মানচিত্র দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে, এই দুই মহাদেশের মধ্যে রয়েছে বিরাট মহাসাগর, তার নাম আমরা দিয়েছি, অতলান্তিক মহাসাগর। এই মহাসাগরের এপারে হ'ল য়ুরোপের তীর, ওপারে হ'ল আমেরিকার তীর, মাঝখানে দুস্তর ভীষণ সমুদ্র।

ইতিহাসের প্রথম দিন থেকেই মানুষ চেষ্টা করছিল, কি করে এই দুস্তর সমুদ্রের বাধা ঠেলে মহাসাগরের এপার আর ওপারের এই ব্যবধানকে দূর করা যায়। বিজ্ঞান এসে মানুষের এই হাজার হাজার বছরের অক্লান্ত সাধনাকে আজ সফল করে তুলেছে।

তোমাদের এখন সেই কাহিনীই বলব।

প্রকৃতি মহাসাগর তৈরী করে এই দুই মহাদেশকে পৃথক করে দিল বটে, কিন্তু এতদিন একসঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকার দরুণ, তারা পরস্পরকে ভুলতে পারল না। তাই মানুষ আসার আগে এ-তীর কথা বলত ও-তীরের সঙ্গে, এ-তীর খবর পাঠাত ও-তীরে,... অবশ্য এক অদ্ভুত উপায়ে।

ঝড়ের মুখে পথ হারিয়ে আমেরিকার তীর থেকে পাখীরা আসত য়ুরোপের তীরে। পায়ে তাদের তখনও লেগে থাকত আমেরিকার মাটী। সেই মাটীর সঙ্গে কখন কখন ছোট ছোট ফলফুলের বীজ লুকিয়ে থাকত।

আমেরিকার উড়ে-আসা পাখীর পায়ের মাটির স্পর্শে য়ুরোপের মাটীতে নতুন ধরণের শস্য ফুটে উঠত, আমেরিকার ফুল য়ুরোপের মাটীতে ফুটে উঠত।

এইভাবে হাজার হাজার বছর ধরে প্রকৃতি এই দুই মহাদেশের আপাতবিচ্ছেদের মধ্যে মিলনের যোগসূত্রটি বজায় রেখে চলেছিল।

মাঝে-মাঝে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সমুদ্রতীরের লোকেরা দেখত সাগরের জলে ভেসে বড় বড় সব গাছ কোথা থেকে তাদের তীরে এসে লেগেছে। সেই সব গাছের কাঠ নিয়ে তারা তাদের ঘর বানাত, আগুন জ্বালাত।

এই সব বড় বড় গাছ কোথা থেকে আসত জান?

আমেরিকার সমুদ্রতীর থেকে তরঙ্গে ভেসে এই সব গাছ য়ুরোপের তীরে লাগত। হয়ত এই সব গাছে চড়ে পাখীর দল অতলান্তিক মহাসাগর পার হয়ে য়ুরোপে আসত। হাজার হাজার বছর আগে এমনি করেই এই দুই মহাদেশ পরস্পরের সঙ্গে যোগ রাখবার চেষ্টা করেছিল।

সে ছিল মানুষ আসবার আগের যুগ।

তারপর এল মানুষ…

* *

*

ভাইকিংদের নাম বোধ হয় তোমাদের অনেকের শোনা আছে। তারা সমুদ্রকে বড় ভালবাসত।

ছোট ছোট নৌকো নিয়ে তারা সমুদ্রের ওপর ঘুরে নির্ভয়ে বেড়াত। সমুদ্রেই তাদের অধিকাংশ জীবন কেটে যেত।

যখন দেখত মৃত্যু এগিয়ে আসছে, তখন যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তারা এই পৃথিবীর মাটীর ওপর থাকত, তাহলে তৎক্ষণাৎ নৌকো নিয়ে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ত।

সমুদ্রের বুকের ওপর ঢেউএর দোলায় নাচতে নাচতে তারা মরণকে বরণ করত।

তাদের আসল দেশ ছিল নরওয়েতে। সেখান থেকে নৌকো নিয়ে তারা ইংলণ্ড ছাড়িয়ে ছোট ছোট দ্বীপে এসে দেখত যে, যখনই কাঠের দরকার হয়, লোকে সমুদ্রের ধারে এসে ঘুরে বেড়ায়, ঢেউএ-ভেসে-আসা গাছের সন্ধানে।

সেই ঘটনা দেখে ভাইকিংদের মনে প্রথম প্রশ্ন জাগে, কোথা থেকে আসে এই সব গাছ?

নিশ্চয়ই সমুদ্রের ওপারে মাটী আছে, দেশ আছে, নইলে গাছ আসবে কোথা থেকে?

নৌকো নিয়ে দলে দলে তারা বেরুল সমুদ্রের ওপারে মাটীর সন্ধানে; এবং বহু অসাধ্য-সাধনরে ফলে তারাই প্রথম আবিষ্কার করে আমেরিকা।

কলম্বাসের আবিষ্কারের প্রায় পাঁচশো বছর আগে যে লোকটি প্রথম নৌকো করে অতলান্তিক মহাসাগর পার হ'ল, তাহার নাম বিয়ারনি-হার-জুলফসন। কিন্তু তিনি আমেরিকায় না নেমে গ্রীণল্যাণ্ডে পদার্পণ করেন।

তারপর লীফ বলে আর একজন ভাইকিং আমেরিকায় পদার্পণ করেন। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড এবং নভোস্কোশিয়া পরিভ্রমণ করে তিনি আইসল্যাণ্ডে ফিরে আসেন।

এই ঘটনার পাঁচ বছর পরে থরফিলকারল সেফনি বলে আর একজন ভাইকিং একশো ষাটজন লোক নিয়ে আমেরিকায় আসেন এবং সেখানে তিন বছর বসবাস করেন।

এই ঘটনার প্রায় পাঁচশো বছর পরে কলম্বাস আবার নতুন করে আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

এই পাঁচশো বছরের মধ্যে মানুষের চরিত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। ভাইকিংদের মত সমুদ্রকে মানুষ আর ভালবাসে না। তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সাহস মানুষের চলে গিয়েছে। সমুদ্রকে মানুষ ভয় করতে শিখেছে। মাটীতে যে নিরাপদ, সমুদ্রের তরঙ্গে সে অসহায় শিশু!

সুতরাং কি করে এই সমুদ্রের ভয় দূর করে এপার-ওপারের ব্যবধান দূর করা যায়, তারই চিন্তায় মানুষ সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে লাগল।

বাষ্প এসে মানুষকে এই সমুদ্রের ভয় থেকে রক্ষা পাবার প্রথম পথ দেখিয়ে দিল। উইলিয়াম সিমিংটন বলে একজন স্কচ বাষ্প-চালিত নৌকো দিয়ে মহাসগের পার হবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু তখনকার বড়লোকদের ধারণা হ'ল যে, এ অসম্ভব ব্যাপার, এবং যখন সিমিংটন "সারলটি ডাণ্ডাস" বলে বাষ্পচালিত নৌকো তৈরী করে নদীতে চালাবার অনুমতি চাইলেন, তখন তাঁকে সে অনুমতি দেওয়া হ'ল না। সিমিংটন দুঃখভারে প্রপীড়িত হ'য়ে মারা গেলেন।

কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ইংলণ্ডের ও আমেরিকার নদীতে বাষ্পীয় যান দেখা দিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় "সাভানা" বলে একটি বাষ্পীয় পোত তৈরী করা হ'ল অতলান্তিক মহাসাগর পার হবার জন্যে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মে সাভানা অতলান্তিক মহাসাগরে পাড়ি দিল এবং সাতাশ দিন পরে লিভারপুলে এসে পৌঁছল।

কিন্তু সাভানা অধিকাংশ পথ পাল তুলে এসেছিল। মাঝে মাঝে মাত্র বাষ্প ব্যবহার করা হয়েছিল।

সমস্ত পথ বাষ্পের সাহায্যে উত্তীর্ণ হবার জন্য এই ঘটনার কিছু-দিন পরে আবার দু'খানি জাহাজ সমুদ্রযাত্রা করল। এবার যাত্রা আরম্ভ হ'ল বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে।

আয়ারল্যাণ্ড থেকে "সিরিয়াস" এবং বৃষ্টল থেকে "গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ" জাহাজ যাত্রা করল। গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ ছাড়বার প্রায় চারদিন আগে সিরিয়াস রওয়ানা হয়।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে সকালবেলায় সিরিয়াস নিউ ইয়র্কে পৌঁছয়, সেই দিনই বিকাল-বেলায় গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ এসে পৌঁছল। তারপর থেকে আরও তাড়াতাড়ি অতলান্তিক পার হবার জন্য একটা তাড়া-হুড়ো পড়ে গেল।

সেই সঙ্গে জলের তলা দিয়ে টেলিগ্রাফের তার বসিয়ে এই দুই মহাদেশের দূরত্ব কমাবার চেষ্টা হতে লাগল। সে এক আলাদা কাহিনী।

তরঙ্গের সঙ্গে সংগ্রাম করে বারবার ব্যর্থ হয়ে তবে মানুষ এই অসাধ্য সাধন করতে সমর্থ হয়েছে।

অতলান্তিকের তরঙ্গের তলায় এই টেলিগ্রাফের তার বসানোর কথা যাঁর মনে প্রথম আসে, তাঁর নাম হ'ল মিঃ জে, এইচ, রোজারস

এবং যিনি কার্যত প্রথম এই অসাধ্যসাধনের ভার নেন, তাঁর নাম হ'ল স্যার চার্লস ব্রাইট।

কিন্তু তাতেও মানুষ সন্তুষ্ট হ'ল না। বেতার তার মনে নতুন সম্ভাবনার কথা জাগিয়ে তুলল।

আজ ইংলণ্ডের ঘরে বসে আমেরিকার বন্ধুর সঙ্গে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে কথাবার্তা বলতে পারে, যেন পাশের ঘরের লোকের সঙ্গে সে কথা বলছে। দুস্তর সাগর আর আজ তার ব্যবধান নয়।

বেতার-টেলিগ্রাফি আজ এতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে যে, লণ্ডন থেকে দরকার হলে কোন লোক বেতার-টেলিগ্রাফের সাহায্যে তার কথা নিউইয়র্কে পাঠাতে পারে এবং তার চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হ'ল—টেলিভিশান। পরস্পর যখন বেতারের মারফৎ কথা বলবে, তখন পরস্পরের চেহারাও দেখা যাবে।

একদিন এই দুই মহাদেশ অবিচ্ছিন্ন ছিল। প্রকৃতি মহাসাগর তৈরী করে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আজ আবার মানুষ তার নিজের চেষ্টায় এই বিচ্ছেদ ঘুচিয়েছে।

যে জিনিসের সাহায্যে আজ মানুষ দেশে দেশে দূরত্ব ঘুচিয়েছে, মানুষে মানুষে মনের যে দূরত্ব, তা যেন তারই দ্বারা ঘুচে যায়···আজ এই হ'ল সকল লোকের অন্তরের কামনা।

—(*)—

যে রাত্রি পার হয়ে এসেছি

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি।

হাতে দীপ নেই। আকাশে তারা নেই।

তেপান্তর মাঠের মাঝখানে তুমি একলা!

তখন কি মনে হয় বল দেখি?

শুধু মনে হয়, কখন সূর্য উঠবে, কখন রাত্রির অন্ধকার শেষ হয়ে দিনের আলো দেখা দেবে। সূর্যের আলো দেখলে প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে।

সেই সূর্যের আলোয় আজ আমরা সব বাস করছি।

এই ১৯৭৪ সাল, এই যে শালের বনে এবারকার শীতের কাঁপন শুরু হয়েছে, এই যে গাছ থেকে সব পাতা ঝরে ঝরে পড়ছে, এই ১৯৭৪ সালের শীতকালে, অর্থাৎ এই বর্তমান সময়ে সূর্যের আলো আমাদের কাছে স্বর্গ রচনা করেছে।

আজ আমরা ভাবতেই পারি না, কি অন্ধকার আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। কি সমস্ত ভয়াবহ কুসংস্কার, আচার-ব্যবহার, ভূত-প্রেতের মত সেই অন্ধকারে ঘুরে বেড়াত।

একশো বছর আগেও, আমাদের দেশে, শুধু আমাদের দেশে কেন, বিলেতেও যে সব কাণ্ড ঘটত, তা ভাবলে সত্যিই ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

আমাদের দেশের দু'একটা কথা বলি।

একশো বছর আগে, আমাদের দেশে এত বড় বড় শহর ত ছিল না। অধিকাংশই ছিল পাড়াগাঁ!

চোর-ডাকাতের উপদ্রব এমন ছিল যে, রাত্রিতে লোকে শান্তিতে থাকতে পারত না। বিশেষতঃ যার টাকাকড়ি কিছু থাকত। ঘরেতে ইঁদুর নড়লে গৃহস্থরা চমকে চমকে উঠত।

রাত্রিবেলায় শোবার সময় ঠাকুর-দেবতার নামের সঙ্গে তাঁরা কচ্ছপের নাম করে শুতেন। সেইজন্যে আমাদের দেশে কচ্ছপের আর এক নামই হয়ে যায় "রাতের কুটুম"।

সেকালের লোকের ধারণা ছিল যে, কচ্ছপের নাম শুনলে চোর নাকি ভয় পায়।

যাঁদের পয়সাকড়ি কিছু থাকত, তাঁরা অনেক সময় রাত্রিবেলায় নিজের ঘরে না শুয়ে গ্রামের কোন দরিদ্র আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে রাত কাটাতেন।

গ্রাম ছেড়ে যদি দশবিশ ক্রোশ দূরে কাউকে যেতে হ'ত, তাহলে বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে যেত।

কিন্তু আজকাল লোকে বর্ধমান, দুর্গাপুর, খড়গপুর থেকেও কলকাতায় ডেলী-প্যাসেঞ্জারি করে, কিন্তু সেকালে কলকাতা অঞ্চল থেকে যদি বর্ধমানেও যেতে হ'ত, তাহলে বিষয়-সম্পত্তি থাকলে উইল করে যেতে হ'ত।

কোন ছেলে আজ ভাবতে পারে যে, তার পিতার মৃত্যুর সঙ্গে তার মাকেও বাঁশের খোঁচায় সহমরণে যেতে হচ্ছে? অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, যখন লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন করে সতীদাহ তুলে দিলেন, তখন আমাদের দেশের কয়েকজন গণ্যমান্য লোক, যাতে সতীদাহ থাকে, তার জন্যে বিলেতে প্রীভি কাউন্সিল বলে বৃটিশ-রাজের যে বিচারালয় আছে, সেখানে আপিল করেন! কেন না, তখন এদেশে চলছিল বৃটিশ শাসনব্যবস্থা।

শুধু আমাদের দেশেই এই সব কুসংস্কার ছিল, তা নয়। যে-দেশকে আমরা আজ সভ্যতার আদর্শ বলে মনে করি, সেই বিলেতেও তখন যে সব ব্যাপার ঘটত, আজ তা কল্পনা করা যায় না।

ভূত-পেত্নীর অত্যাচার অবশ্য সে সময় আমাদের দেশে খুবই বেশী ছিল। কিন্তু ভূত-পেত্নীর জন্যে আমাদের দেশে কখনও আইন তৈরী হয়নি।

শুধু ইংলণ্ডে নয়, সারা য়ুরোপে তখন ধারণা ছিল যে, জগতে যত কিছু অনিষ্ট সব ভূত-পেত্নীরাই করে। আর একদল লোক আছে, যারা যাদুবলে সেই ভূত-পেত্নীদের কাজে লাগায়।

আইন হ'ল,ঐ সব যাদুকর ধরা পড়লেই মৃত্যুদণ্ড ভোগ করবে।

এমনি ভাবে ভূত-পেত্নীর নামে তখন প্রতিদিন কত নিরীহ নর-নারীকেই না প্রাণ দিতে হয়েছে!

অমন যে জোয়ান অফ আর্ক, তাঁকেও সেই আইনের দোহাই দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়।

দরিদ্র বৃদ্ধ রমণীদের ওপর বেশীর ভাগ সন্দেহ করা হ'ত, আজকে আমরা জানি কেন মড়ক হয়, কেন ইংলণ্ডে ভয়াবহ প্লেগ হয়েছিল; কিন্তু তখনকার লোকের ধারণা হ'ল যে, এই সব বুড়ী ডাইনীদের জন্যে প্লেগে লোক মারা যাচ্ছে!

প্লেগে সত্তর হাজার লোক মারা যায় এবং সত্তর হাজার লোকের মৃত্যুর কারণ বলে ধরে নিয়ে বহু হতভাগ্য স্ত্রীলোককে আইনের বলে মেরে ফেলা হয়। প্লেগের নির্মমতার চেয়ে এ ঢের বেশী নির্মম! আজ ইংলণ্ডে কেউ ভাবতেও পারে না যে, একদিন ইংলণ্ডে, যে-ইংলণ্ডে তখন শেকসপীয়ার জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই ইংলণ্ডে এই সব ব্যাপার সম্ভব ছিল!

যাকে ডাইনী বলে সন্দেহ করা হ'ত, তার বিচার হ'ত আরও চমৎকার ভাবে। একটা থলের ভিতর পূরে তাকে জলে ফেলে দেওয়া হ'ত···যদি থলেশুদ্ধ সে ভেসে উঠত, তাহলে সে হ'ত নির্দোষ, আর যে তলিয়ে যেত, বিচারকেরা বুঝতেন যে, সত্যই সে পাপী।

ক্রমওয়েলের নাম ইতিহাসে ছেলেমেয়েরা পড়ে থাকে। নিউব্যারীর যুদ্ধের আগের দিন রাত্রিবেলায় তাঁর লোকেরা খবর পেল যে, সে অঞ্চলে একটা ডাইনী আছে। সেই রাত্রিতে সেই অসহায় বৃদ্ধাকে ঘর থেকে বা'র করে এনে, তাকে জলে ডুবিয়ে মেরে, তবে তারা নিশ্চিন্ত হ'ল!

প্রথম যখন জার্মানীতে বই ছাপা হতে লাগল, সেকালের বিচারকদের বিশ্বাস হ'ল যে, বই ছাপান হ'ল ভূতের কাণ্ড! জনকয়েক জার্মান লুকিয়ে ফ্রান্সে কতকগুলি ছাপান বই নিয়ে যায়।

তক্ষুনি হুকুম হয়ে গেল যে, তাদের ধরে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হোক। অবশ্য সে-যাত্রা তারা কোন রকমে পালিয়ে বেঁচেছিল। যখন ইংলণ্ডে প্রথম ছাপান বাইবেল আসে, লণ্ডনের বিশপ নিজে দাঁড়িয়ে সেন্ট-পল গির্জার সামনে সেই সব বাইবেল পুড়িয়েছিলেন।

কত বিচিত্র রকমের সব ট্যাক্স ছিল, তা ভাবলে আজ আতঙ্কিত হয়ে উঠতে হয়!

ইংলণ্ডের প্রধান শক্তি হ'ল কয়লা; সেই কয়লার প্রচলন বন্ধ করার জন্য একদিন চিমনীর ওপর ট্যাকস ছিল। সূর্যের আলো যাতে ঘরে না আসতে পারে, তার জন্যে জানালার ওপর ট্যাকস ছিল। দরিদ্র লোকদের ঘরে জানালা দিয়ে সূর্যের আলো আসবার উপায় ছিল না!

"নাড়ু-গোপাল" "কদম গাছ" প্রভৃতি শাস্তির নাম, বোধ হয়, তোমরা শোননি। আমাদেরই এ বাঙলা দেশে সেকালে যাদের গুরুমশাইএর পাঠশালায় পড়তে হয়েছে (গুরুমশাইএর পাঠশালা ছাড়া ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়বার আর কোন জায়গা তখন ছিল না), সেখানে ছেলেদের জন্যে এই সব শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

"নাড়ু-গোপাল" হ'ল সব চেয়ে কম শাস্তি। দু'পা এবং বাঁ হাত মাটিতে থাকবে, ডান হাতে থাকবে একটি ভারী ইঁট। যিনি নাড়ু-গোপাল হতেন, তাঁকে সেই ইঁট হাতে করে থাকতে হ'ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাকি সেই ভাবেই নাড়ু চুরি করেছিলেন।

তারপর হ'ল "কদম গাছ"। পাঠশালার খুঁটি নীচে থেকে ওপর পর্যন্ত বিচুটি আর আলকুষিতে জড়ান হ'ত। সেই খুঁটি ধরে অপরাধী ছাত্রকে খালি গায়ে ওপরে উঠতে হ'ত।

অনেক সময়ে আবার থলির ভেতর বিচুটি পূরে তার মধ্যে অপরাধীকে বন্ধ করে রাখা হ'ত!

আজ তোমরা কেউ পার, সেই পাঠশালায় গিয়ে পড়তে?

—(*)—

পণ্ডিতেরা যখন ভুল করেন

জগতের সব চেয়ে বড় পণ্ডিত বলে যাঁদের আমরা আজও সম্মান করি, তাঁদের এক একটা ভুলের কথা ভাবলে, আজ সত্যিই বিস্মিত হ'তে হয়। সাধারণ লোকে যখন ভুল করে, তখন জগতের বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু বড়লোকেরা যখন ভুল করেন, তখন যে কি সর্বনাশ হতে পারে, তা ভাবা যায় না।

অ্যারিষ্টটল ভুল করেছিলেন বলে গ্যালিলিওকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল, ব্রুনোকে পুড়ে মরতে হয়েছিল, দু'হাজার বছর পর্যন্ত য়ুরোপে বিজ্ঞানসাধনা বাড়তে পারেনি!

পুরাকালের গ্রীক পণ্ডিতদের নাম নিশ্চয়ই তোমরা জান... অ্যারিষ্টটল, প্লেটো, থেলস, পাইথাগোরাস...আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল দেশের লোক এঁদের কথা উঠলে শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করেন; কিন্তু এঁদেরই ভুলের জন্যে, এঁদের মৃত্যুর পর দু'হাজার বছর পর্যন্ত, বিজ্ঞান একপাও এগোতে পারেনি।

তাঁরা যা বলে গিয়েছিলেন, অভ্রান্ত সত্য বলে লোকে তাই মেনে নিয়েছিল। তাঁদের যে ভুল হ'তে পারে, তখন কেউ-ই তা কল্পনা করতে পারত না;...এবং যে কেউ তাঁদের মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে যেত, তাঁকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হ'ত... চিরকাল কারাগারে বন্ধ করে রাখা হ'ত,...এমন কি আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হ'ত!

অ্যারিষ্টটল বলে গেলেন যে, আমাদের এই পৃথিবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা আমাদের পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভগবান এই পৃথিবীর মানুষকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসেন ব'লে তিনি এই ব্যবস্থা করেছেন।

ক্রমশ ব্যাপারটা এমন হ'ল যে, যে অ্যারিষ্টটলের এই কথা অবিশ্বাস করে, অর্থাৎ যে বলে, আমাদের এই পৃথিবীও অন্য সব গ্রহ-উপগ্রহের মত সূর্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে যে শুধু ভ্রান্ত, তা নয়, সে ভগবানের শক্তিতে অবিশ্বাসী। সুতরাং তার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত; ...এবং পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে...একথা বলার দরুণ সত্যই অনেক লোককে আগুনে পুড়ে মরতে হয়েছে!

গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস, কেপলার...এঁরা এসে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, অ্যারিষ্টটল ভুল করেছেন।

এই সত্য প্রচার করার জন্যে গ্যালিলিওর কি শাস্তি হয়েছিল, তা তোমরা সকলেই জান। মিথ্যা বলে জানলেও, বুড়ো বয়সে হাঁটু গেঁড়ে মৃত্যুর ভয়ে তাঁকেও বলতে হয়েছিল, পৃথিবী স্থির!

কোপার্নিকাস যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন তাঁর লেখা ছাপাতে তিনি সাহস পান নি। জীবনের শেষ সময় তাঁর এক ছাত্র লুকিয়ে জার্মানি থেকে তাঁর পুঁথি বই-আকারে ছেপে নিয়ে আসেন। যখন তাঁর হাতে সেই ছাপা বই এল, তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে। সেই বইখানা বুকের ওপরে রেখে তিনি মারা গেলেন।

কেপলার যে-দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে-দেশে ধর্মযাজকদের শাসনের কড়াকড়ি থাকলেও, সৌভাগ্যবশত সে-দেশে তখন একদল নতুন আদর্শের লোক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা অতীতকে 'অন্ধভাবে'

মানার বিরুদ্ধে ছিলেন, তাই কেপলার কথঞ্চিৎ রক্ষা পেয়েছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাননি।

যাঁদের ওপর বিচারের ভার ছিল, তাঁদের ধারণা হ'ল যে, কেপলারের মা ডাইনী, ছেলেকে 'গুণ' করেছে, অতএব কেপলারের মাকে পুড়িয়ে মারা উচিত।

কারণ, য়ুরোপের জ্ঞানী-গুণীরা সেদিন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ডাইনীরাই পৃথিবীর অঘটন ঘটায়।

ফ্রান্সের এক দরিদ্র চাষার মেয়ে একবার অঘটন ঘটিয়েছিল। ফ্রান্সের বড় বড় সব যোদ্ধা যা পারেনি, সে তাই পেরেছিল। তার নাম ছিল জোয়ান। সে বিদেশী শত্রুর হাত থেকে স্বদেশকে রক্ষা করেছিল। সেই অপরাধে সেদিন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সকলের চেয়ে শিক্ষিত বিচারকেরা ব'সে বিচার ক'রে ঠিক করলেন যে, জোয়ান ডাইনী, অতএব তাকে পুড়িয়ে মারা হোক;—এবং তাকে পুড়িয়ে-ই মারা হ'ল।

সেদিনকার সেই সব কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আজ আর নেই। কিন্তু মানুষের ভুল বোঝার পালা এখনও শেষ হয়নি। বড় বড় যোদ্ধা, বড় বড় বৈজ্ঞানিক, বড় বড় পণ্ডিত, এই সেদিন পর্যন্ত যে-সব ভুল করেছেন, তা ভাবলে সত্য সত্যই অবাক হতে হয়।

বাষ্পের সাহায্যে জাহাজ চালাবার কথা প্রথম বরার্ট ফুলটনের মাথার আসে। বহুদিন চেষ্টার ফলে তিনি কাগজে-কলমে তার নক্সা সব ঠিক করে ফেলেছিলেন। কিন্তু জাহাজ তৈরী করবার মত টাকা তাঁর ছিল না।

সেই সময় নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংরেজদের তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। জল-যুদ্ধে নেপোলিয়ান ইংরেজদের কাছে হেরে যাচ্ছেন। সেই সময়

ফুলটন তাঁর বাষ্প-চালিত জাহাজের নক্সা নিয়ে নেপোলিয়ানের সঙ্গে দেখা করলেন।

কিন্তু নেপোলিয়ান ফুলটনের কথা বিশ্বাস করলেন না। ফুলটন আমেরিকায় গিয়ে বাষ্পচালিত জাহাজ তৈরী করলেন। নেপোলিয়ান যদি সেদিন ভুল করে ফুলটনকে ফিরিয়ে না দিতেন, তাহলে ইংলণ্ডের ইতিহাস হয়ত অন্য রকম হয়ে যেত।

বাষ্পচালিত রেলগাড়ীর আদি-প্রবর্তক-রূপে আমরা জর্জ ষ্টিফেনসনকেই জানি। কিন্তু তাঁর জন্মাবার আগে ফ্রান্সে কুনো বলে একজন বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনিই সকলের চেয়ে আগে বাষ্পচালিত গাড়ী তৈরী করেন। হঠাৎ একদিন পরীক্ষা করতে গিয়ে প্যারিসের রাস্তায় গাড়িটা উলটে যায়।

প্যারিসের লোকেরা কুনোর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে নালিশ করল, লোকটা কি একটা ভয়ঙ্কর যন্ত্র তৈরী করে লোকের সর্বনাশ করবার চেষ্টায় আছে। বিচারকদেরও সেই ধারণাই হ'ল। পুলিশের লোকেরা এসে কুনোর গাড়ীটা কেড়ে নিয়ে সরকারী অস্ত্রখানায় তালা-চাবি দিয়ে রেখে দিল। হতভাগ্য কুনো অপরিচিত থেকেই জগৎ হ'তে বিদায় নিলেন!

জর্জ ষ্টিফেনসনের আগে উইলিয়াম মারডক বলে একজন অত্যন্ত প্রতিভাশালী লোক স্কটল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বাষ্পচালিত গাড়ী তৈরী করে পরীক্ষার জন্য একদিন রাত্তির বেলায় তিনি সেটা পথে চালাতে আরম্ভ করলেন। তিনি গির্জের সামনে আসতেই পাদ্রীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাদ্রী দেখেন, অন্ধকারে শব্দ করে লাল আলোর মতন কি একটা ছুটে চলেছে। পরের দিনই তিনি সকলকে ডেকে জানালেন যে গ্রামে শয়তান এসেছে, এবং খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, শয়তান

মারডকের কাঁধেই ভর করেছে। মারডকের আর গাড়ী তৈরী করা হ'ল না। শয়তানেরই জয় হ'ল।

এই উইলিয়াম মারডকই সর্বপ্রথম গ্যাস থেকে আলো জ্বলবার ব্যাপার আবিষ্কার করেন। তখন ইংলণ্ডের সব চেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন, স্যার হ্যামফ্রী ডেভী। শুধু ইংলণ্ডে কেন, য়ুরোপে তখন তাঁর মত বৈজ্ঞানিক ছিল না বললেই হয়।

তিনি যখন শুনলেন যে মারডক বলে একজন লোক বলেছে যে, গ্যাসের আলোয় লণ্ডনের পথ আলোকিত করে দেবে, তখন তিনি হেসে বলেছিলেন—"সেন্ট পল গির্জার গম্বুজটাকে লোকটা কি 'গ্যাসোমিটারে' পরিবর্তিত করতে চায় ?"

স্যার ওয়ালটার স্কট তাঁর এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—"একটা মজার খবর আছে। মারডক বলে একজন পাগল বলেছে, লণ্ডনের রাস্তায় সে আলো জ্বালবে, অবশ্য ধোঁয়া দিয়ে ?"

জর্জ ষ্টিফেনসনের যখন রেল-লাইন পাতবার জন্যে পার্লামেন্টের কাছে অনুমোদন চাইলেন, তখন পার্লামেন্টের সভ্যরা যে-ভাবে তার প্রতিবাদ করেছিলেন, আজ তার বিবরণ পড়লে আমাদের হাসি পায়। পাদ্রীর দল বললেন—"গির্জার সামনে দিয়ে রেলগাড়ী গেলে উপাসনার ব্যাঘাত হবে।" কৃষকেরা বললে—"গ্রামের মধ্য দিয়ে রেলগাড়ী গেলে গরুবাছুর একটাও বেঁচে থাকবে না।" জমিদাররা বললেন—"এঞ্জিনের আগুন লেগে ঘরবাড়ী সব পুড়ে যাবে।"

পার্লামেন্ট সভায় তাই নিয়ে দিনের পর দিন আলোচনা হ'ল। একজন পার্লামেন্টের সভ্য ষ্টিফেনসনকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ধরুন, আপনার ইঞ্জিন ঘণ্টায় দশ মাইল চলেছে। হঠাৎ একটা গরু লাইনের ওপর এসে পড়েছে। এ হেন অবস্থায়, গরুটার অবস্থা শোচনীয় হবে

না।" ষ্টিফেনসন ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—"গরুর পক্ষে সেটা শোচনীয় অবস্থাই বটে!" ("Yes, very awkward for the cow!")

আমেরিকায় যখন রাইট-ভ্রাতৃদ্বয় বায়ুর চেয়ে ভারী আকাশ-যান তৈরী করবার চেষ্টা করছিলেন, সেই সময় আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতের অধ্যাপক নিউকম্ব্ তাঁদের বিরত করবার চেষ্টা করেছিলেন।

যখন লিউয়েনহুক অনুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী করে, দৃষ্টির অগোচর জীবাণুদের সন্ধান পেলেন, তখন তিনি সেই সব জীবাণুর বর্ণনা দিয়ে বিলাতের রয়েল সোসাইটিতে চিঠি লেখেন। রয়েল সোসাইটির সভ্যেরা প্রথমে সে সব কথা গ্রাহ্যই করেন-নি।

ইংলণ্ডে ফ্রীজগ্রীন যখন সর্বপ্রথম ক্যামেরার সাহায্যে চলচ্চিত্র তৈরী করলেন, তিনি ইংলণ্ডে সামরিক বিভাগে তাঁর আবিষ্কারের কথা জানিয়ে চিঠি লিখলেন।

সামরিক বিভাগের কর্তারা ভেবেই পেলেন না, চলচ্চিত্র দিয়ে দেশের কি সুবিধা হতে পারে। তাঁরা ফ্রীজগ্রীনের কোন খবর নেওয়ারও দরকার বোধ করলেন না। ওধারে আমেরিকায় সেই আবিষ্কার নিয়ে দেখতে দেখতে কোটি কোটি টাকার বিরাট ব্যবসায় গড়ে উঠল।

কলাম্বাস যখন বলেছিলেন, সমুদ্রের ওপারে মহাদেশ আছে, তখন সমস্ত ইউরোপের মধ্যে একজন লোকও তাঁর কথায় বিশ্বাস করে নি। য়ুরোপের বড় বড় রাজার দরবারে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, পাগল বলে তাঁর কথা সকলেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। সমুদ্রের ওধারে ভয়াবহ সব জলজন্তুদের রাজত্ব, তারা হাঁ করলে এক একটা আস্ত জাহাজ ঢুকে যায়! তারও ওধারে আছে জলন্ত আগুনের দেশ! কে যাবে মরতে?

যেদিন স্পেনের রানীর অনুগ্রহে কলাম্বাস নৌকো এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেলেন, সেদিন কিন্তু সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে তিনি একজনও

সঙ্গী পান-নি। কেউ-ই কলাম্বাসের সঙ্গে যেতে চায় নি। সকলেরই স্থির বিশ্বাস যে, লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, সে আত্মহত্যা করতে চলেছে। কে যাবে তার সঙ্গে মরতে ?

যদিও বা রাজার অনুগ্রহে টাকাকড়ি পাওয়া গেল, কিন্তু সেই দুস্তর সমুদ্রের পথে একা তো যাওয়া যায় না ? দেশের একটা লোকও কলাম্বাসের সঙ্গে যেতে রাজী নয়।

অনেক চিন্তার পর স্থির হ'ল যে, কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে যে সব কয়েদী আছে, যাদের আজ-বাদে কাল ফাঁসী হবে, তাদের কলাম্বাসের সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীরা দেখলে, মরতেই যখন হ'ত, তখন কলাম্বাসের সঙ্গে যেতেই বা ক্ষতি কি ?

যেদিন কলাম্বাস সেই সব ফাঁসীর আসামীদের নিয়ে যাত্রা করলেন, কাতারে কাতারে লোক তীরে দাঁড়িয়ে কলাম্বাসের মস্তিষ্কবিকৃতির পরিণামের কথা ভেবে কেঁদেছিল।

একটি লোকও সেদিন য়ুরোপে ভাবতে পারে নি, কলাম্বাস আবার ফিরে আসবেন, আর-আধখানা পৃথিবীর খবর নিয়ে !

ইতিহাসের পেছন দিকে চাইলে এমনিধারা অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে জ্ঞানী লোকেরাও ভুল করে মানুষের এগিয়ে চলাকে বাধা দিয়েছেন। কিন্তু তবুও মানুষের এগিয়ে চলা কিছুতেই বন্ধ হয় নি···কোন দিন হবেও না।

—(*)—

বড় হবার সাধনা

প্রথমেই তোমাদের একটা কথা বলে রাখি, বড় হবার কোনও কল বা যাদুমন্ত্র নেই…ইংরেজীতে যাকে বলে 'ফরমুলা', তাও কিছু নেই। বড় হবার একটা মাত্র পথ…এবং সে-পথ সকলের জন্যেই খোলা আছে। সে পথ হ'ল, পরিশ্রম করা, কাজ করে যাওয়া। কাজ করে যাওয়া ছাড়া বড় হবার আর দ্বিতীয় কোনও পথ নেই।

দূর থেকে মনে হয়, যারা জীবনে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন, তাঁরা যেন দৈব সহায়তালাভ করেছিলেন, তা না হ'লে, এরকম অসাধ্য সাধন তাঁরা করতে পারলেন কি করে? দৈব যদি সাহায্যও করে থাকেন, জানবে, সেটা হ'ল নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রম করবার পুরস্কার। শ্রম করলেই সে পুরস্কার আমরা সবাই পেতে পারি।

জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর নাম অনেকেই শুনেছ। তাঁর আঁকা ছবি এবং মূর্তি যদি চোখে পড়ে, তাহলে আপনা থেকেই বলে উঠতে ইচ্ছা হবে, এমন বিরাট এবং এমন সুন্দর জিনিস কি মানুষে গড়ে তুলতে পারে? আসলে সেই সব ছবি এবং মূর্তির পেছনে ছিল কঠোর—অতি কঠোর পরিশ্রম। তিনি কি রকম খাটতেন, শুনবে?

শেষ রাত্রে শোবার সময় তিনি পোষাক পরেই শুতেন…ঘুম ভাঙলেই যাতে তিনি কাজ আরম্ভ করতে পারেন। ঘরের এক কোণে এক চাঁই পাথর এনে রেখে দিতেন…যদি কোনও কারণে রাত্রে ঘুম না আসে, তা হলে বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি না দিয়ে সেই পাথর নিয়ে কাজ আরম্ভ করবেন। একবার একটা গির্জার গায়ে ছবি আঁকবার সময় তিনি সেই কাজে এতদূর তন্ময় হ'য়ে যান

যে, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে তিনদিন তিনি কড়ি-কাঠের দিকে সমানে ঘাড় তুলে রেখে এঁকে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁর ঘাড় চিরকালের মত বেঁকে যায়।

স্যার ওয়ালটার স্কটের নাম নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছ। তাঁর রচিত সব মনোরম গল্পের পেছনে ছিল কঠোর অধ্যবসায়।

যখন তাঁর বয়স পঞ্চান্ন বছর, তখন তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি বালান্টাইন কোম্পানী বলে এক প্রেসের অংশীদার ছিলেন। কালক্রমে সেই প্রেসটি শোচনীয় ভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং এক লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের মধ্যে চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের ঋণ তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ে।

ইচ্ছে করলে তিনি পাওনাদারদের ঠকাতেও পারতেন, কিন্তু তা না করে তিনি স্থির করলেন যে, তিনি বই লিখে ঋণের সেই টাকা শোধ করবেন; কিন্তু মনে রেখো, তাঁর বয়স তখন পঞ্চান্ন বছর এবং ঋণের পরিমাণ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড!

দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত লেখনী চালনা ক'রে প্রত্যেক মাসে একখানা ক'রে বৃহৎ উপন্যাস লিখে তিনি তাঁর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেন।

আমেরিকার স্বাধীনতা-সমরের সময় কয়েকজন আমেরিকান সৈন্য মিলে একটা কাঠের গুঁড়ি তোলবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তাদের শক্তিতে কুলোচ্ছিল না। সামনে একজন করপোরাল ঘোড়ার পিঠে বসেই মুখের কথায় তাদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন।

ঘোড়ায় চড়ে একজন উচ্চ-রাজকর্মচারী সেই সময় সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সৈন্যদের প্রাণপণ চেষ্টা দেখে তিনি নিজে ঘোড়া থেকে নেমে তক্ষুণি তাদের সঙ্গে কাঠ ঠেলতে আরম্ভ করলেন। কাজ শেষ হলে

তিনি করপোরালকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি ঘোড়া থেকে নেমে কেন এদের সঙ্গে হাত লাগাও নি?" করপোরাল বিস্মিত হয়ে উত্তর দিল—"আপনি ভুল করছেন, আমি একজন সামান্য সৈনিক নই! আমি একজন করপোরাল, আমি কি করে এদের সঙ্গে মিলে কাঠ ঠেলি?"

কর্মচারীটি হেসে ঘোড়ায় চড়ে বললেন—"ঠিক বল্‌ছ তুমি! আমিই ভুলে গিয়েছিলাম যে, তুমি একজন করপোরাল! তোমার কাঠ ঠেলতে লজ্জা হয়, কিন্তু দেখ, প্রয়োজন হলে কাঠ ঠেলতে আমার লজ্জা হয় না···আমার নাম জর্জ ওয়াশিংটন।"

জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের জন্মদাতা!

মানুষের জীবন থেকে জাতির জীবনের দিকে চাও···রোমের ইতিহাসের দিকে চাও। দেখবে, তারা যতদিন কর্মশীল পরিশ্রমী ছিল, ততদিন তাদের বিজয়শঙ্খ দেশে দেশান্তরে বেজে উঠেছে! তারপর তারা সঞ্চিত ঐশ্বর্য ভোগের মধ্যে ভুলে গেল পরিশ্রমের মর্যাদা। মানুষকে কিনে তাকে ক্রীতদাস ক'রে তাকে খাটাতে লাগল এবং সেই সঙ্গে শ্রমকে, কর্মকে ঘৃণা করতে শিখল···শ্রম করা যেন ক্রীতদাসের কাজ···ভদ্র রোমানের পক্ষে হেয়। ভদ্র হতে গিয়েই রোমানেরা তাদের বিরাট সাম্রাজ্য হারাল। বর্বর হূণদের একটি আঘাতে এক নিমেষে ভেঙ্গে গেল সেই বিরাট সাম্রাজ্য।

কি মানুষের জীবনে, কি জাতির জীবনে—যেদিকে আমরা ফিরে চাই, দেখি, যেখানেই ধূলিমুষ্টি হচ্ছে স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত, যেখানেই হচ্ছে কিছু নতুন সৃষ্টি, সেখানেই সৃষ্টির সমস্ত রকমের উপাদানের মধ্যে একটা উপাদান সকল জায়গায় সমান ভাবে আমরা দেখতে পাই ···সেটা হচ্ছে, অক্লান্ত ধৈর্যের সঙ্গে পরিশ্রম করবার শক্তি।

—(*)—

লাষ্ট বয়ের সান্ত্বনা

খেলায় হেরে গিয়ে যারা দুঃখ করে অথবা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে, তারা কখনও কোন খেলায় জিততে পারে না। জীবনেও ঠিক তাই।

বিফলমনোরথ হয়ে যারা ভাবে, জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল, তারা কখনও কি জীবনের কোন খেলায় জিততে পারে ?

বার বার হেরে যাবে, বার বার চেষ্টা করবে, একদিন কিন্তু খেলায় তোমারই হবে জয়। খেলায় এগিয়ে যায় তারাই, যারা বারবার হেরে গিয়েও বারবার এগিয়ে চলবার চেষ্টা করে। একদিন না একদিন তারা এগিয়ে যাবেই।

ক্লাসে "লাষ্ট বয়" হয়েছ বলে কোন দুঃখ ক'রো না—ক্লাসের বহু "লাষ্ট বয়" জীবনে ও ভুবনে "ফার্ষ্ট বয়" হয়েছে। অকেজো বলে যদি আত্মীয়স্বজনের কাছে তিরস্কৃত হও, সে তিরস্কারে নিরুৎসাহ হ'য়ো না, বহু অকেজো ছেলে পরে জগতে এমন সব কাজ করে যেতে পেরেছে, যা এই পৃথিবীকে ওলট-পালট করে দিয়েছে।

স্যার আইজাক নিউটনের নাম তোমরা নিশ্চয়ই জান। এত বড় অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিত পৃথিবীতে বিরল বললেই চলে। কিন্তু তিনি যখন স্কুলে পড়তেন, তখন তিনি ছিলেন ক্লাসের লাষ্ট বয় এবং সকলের চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে, বরাবর তিনি জ্যামিতিতেই 'ফেল' করতেন। অথচ পরবর্তী জীবনে নিউটন জ্যামিতিরই একজন বড় পণ্ডিত হলেন।

ইতিহাসে চিরজীবী লোকদের মধ্যে নেপোলিয়ান একজন। শুধু বীর বলে নয়, এত বড় প্রতিভা, এত তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং কর্মশক্তি নিয়ে

পৃথিবীতে খুব কম লোকই এসেছেন। সেই নেপোলিয়ান স্কুলে তাঁর ক্লাসে বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষায় সর্বদাই ৪১ জনের পেছনে থাকতেন। তাঁর ক্লাসে তাঁকে নিয়ে ৪২ জন ছাত্র ছিল। যে ৪১ জন ছেলের পেছনে তিনি থাকতেন, তাদের নাম পর্যন্ত কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, আর যে-ছেলে থাকত, তাদের সকলের পেছনে, মানবজাতির ইতিহাসে আজ তারই নাম রইল, একেবারে প্রথম পাতায়।

ইংলণ্ডের অমর লেখিকা জর্জ এলিয়টের নাম সকল শিক্ষিত লোকেই জানে। মেয়েদের মধ্যে এত বড় প্রতিভাশালী লেখিকা জগতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। অথচ প্রথম যখন তাঁর লেখা-পড়া শুরু হয়, তখন তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং শিক্ষকেরা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেছিলেন, এত বড় বোকা মেয়ে দুনিয়ায় আর জন্মায় নি...ঘরকন্নার কাজ ছাড়া জগতে তাকে দিয়ে আর কিছু হবে না। কিন্তু আজ সেই বোকা মেয়েটির বই জগতে প্রত্যেক সভ্য দেশের লোক নিজের নিজের ভাষায় অনুবাদ করে পড়ছে।

স্যার ওয়ালটার স্কট প্রায়ই স্কুলে ফেল হতেন। অলিভার গোল্ডস্মিথ ছিলেন ক্লাসের লাষ্ট বয়। আনাতোল ফ্রান্স...ফ্রান্সে যার চেয়ে পণ্ডিত এবং রসিক লোক ইদানীং জন্মগ্রহণ করেন নি, তিনি কখনও একবারে পরীক্ষায় পাস করতে পারতেন না। প্রথম বার পরীক্ষা দেবার সময় তিনি শুধু ফেল করেছিলেন, তা নয়; এত কম নম্বর খুব কম ছেলেই নাকি পায়।

যে জেমস ওয়াট আবিষ্কারের জগতে যুগান্তর নিয়ে এলেন, বোকা বলে ক্লাসের ছেলেরা তাঁকে ক্ষেপাত; অলস বলে আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁকে তিরস্কার করতেন। সেই অলস ছেলের মগজ থেকে যে সব কলকব্জা বেরুল, আজ জগৎ তারই ঘর্ঘর শব্দে ভরে রয়েছে।

রবার্ট ক্লাইভ ভারতের মত বিশাল সাম্রাজ্য ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ছেলেবেলায় কোন দিন কেউ কল্পনাও করতে পারে নি যে, সেই ছেলেকে দিয়ে দেশের কোন বড় কাজ হতে পারে। তিনি ছিলেন পাড়ার "ডাক-সাইটে" বদমায়েস ছেলে। এমন কোন স্কুল পাওয়া গেল না, যেখানে ক্লাইভ পরীক্ষায় পাশ করতে পারে। পাড়ার লোকেরা উৎপাতে অস্থির, বাড়ীর লোকেরা তার চেয়ে বেশী যন্ত্রণা ভোগ করতেন। ক্লাইভের বাবা যখন কোন রকমে তাঁকে ভাল করতে পারলেন না, তখন তাঁর দায় থেকে এক রকম নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই একটা জাহাজে চাকুরি জুটিয়ে দিয়ে তাঁকে গ্রাম থেকে বিদায় করলেন। সেই 'বাপে-খেদানো-মায়ে-তাড়ানো' ছেলেই এত বড় একটা সাম্রাজ্য তাঁর জাতির হাতে তুলে দিয়ে যান।

এই বার স্বাস্থ্যের দিক থেকে একজন লাষ্ট বলের কথা বলি।

ক্লাইভ যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে আঠারো লক্ষ বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে দিয়েছিলেন, তেমনি সিসিল রোডেসও বৃটিশ সম্রাজ্যের সঙ্গে সাত লক্ষ বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে দিয়েছিলেন। তাঁরই নাম-অনুসারে আফ্রিকার একটি বিরাট অংশের নাম হয় রোডেসিয়া। আফ্রিকার এই বিরাট রাজত্ব জাতির হয়ে একা সিসিল রোডেস অধিকার করেন। সেই সিরিল রোডেসের স্বাস্থ্য ছেলেবেলায় খুব খারাপ ছিল। যখন তাঁর একুশ বছর বয়স, তখন ডাক্তাররা সকলে একবাক্যে বললেন যে, বড় জোর আর ছ'মাস এ ছেলে টিকে থাকতে পারবে। সেই দুর্বল অবস্থাতেই সিসিল আফ্রিকায় পালিয়ে যান এবং ডাক্তারদের ভবিষ্যৎ বাণীকে ব্যর্থ করে আরও আটাশ বছর বেঁচে ছিলেন। শুধু বেঁচে থাকা নয়, যখন মরে গেলেন, তখন জাতির হাতে সেই দুর্বল ছেলে এক সুবিশাল সাম্রাজ্য তুলে দিয়ে গেলেন।

জর্জ বার্নাড শ'র লেখনীকে আজ কে না মূল্য দেবে? কিন্তু তাঁর জীবনের ত্রিশ বছর পর্যন্ত লিখে সবশুদ্ধ তিনি পাঁচ পাউণ্ডও উপার্জন করতে পারেন নি। পাঁচ বছর ধরে সংবাদ-পত্রের আপিসে লেখা পাঠিয়েছেন, পাঁচ বছর ধরে একে একে সব সংবাদপত্রের অফিস থেকে তাঁর লেখা অমনোনীত হয়ে ফিরে এসেছে। যখন তাঁর পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, তখনও সাহিত্যিক হিসেবে তাঁকে কেউ চিনত না। অথচ, উত্তরকালে তিনি তাঁর লেখা একটা প্রবন্ধ থেকে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর যত বেতন, তত টাকাই পেয়েছিলেন।

লয়েড জর্জের নাম জগতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত গত প্রথম বিশ্বমহাসমরে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর বাল্যকালে কেউ কল্পনাও করতে পারে নি যে, সেই ছেলেকে দিয়ে কোন কিছু দেশের কাজ হতে পারে।

এইভাবে ইতিহাসের পাতা খুললে আমরা দেখতে পাব, আরও কত মহাপুরুষ এমনি ধারা প্রথম জীবনের সমস্ত পরাজয়কে দূরে ঠেলে ফেলে সকলের আগে এগিয়ে গিয়েছেন! কত লাষ্ট বয় ফার্ষ্ট বয় হয়ে গিয়েছেন!

—(*)—

তবু তুচ্ছ, তুচ্ছ নয়

ছোট বা তুচ্ছ বলে জগতে কিছু নেই। প্রত্যেক জিনিসই অন্যের তুলনায় ছোট কিংবা বড়।

আমাদের পৃথিবীর তুলনায় এককণা ধূলো ছোট বলে মনে হয়, কিন্তু আমাদের সেই পৃথিবী আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় এককণা ধূলোর সমান মাত্র। আবার, সেই ছোট ধূলোর কণা, সে-ও একটা পরমাণুর কাছে বিরাট, অতি বিরাট। ভূমধ্যসাগরে জলের যতগুলি ফোঁটা ধরে, একটা জলের ফোঁটায় আবার ততগুলি পরমাণু ধরে।

একটা সামান্য বীজ—তা থেকে একটা শতাব্দী ধরে একটা দেশ তার খাদ্য পেতে পারে। এক মুঠো ধান তাই থেকে একযুগ পরে সোনার ফসলে ভরে ওঠে একটা সমগ্র দেশ। মার কোলে একরত্তি এক ছেলে···তাই বড় হয়ে হবে নিউটন, শেকস্পীয়ার, কালিদাস, ফেরদোসি, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী।

দৃষ্টির আগোচর একটা জীবাণু, এত ছোট যে, কোটি কোটি জীবাণু একত্র করলে তবে একটা সরষের সমান হয়। তার এত শক্তি যে, গ্রামকে গ্রাম সে জনশূন্য করে দিতে পারে! মানুষের তৈরী বড় বড় কামান আজ পর্যন্ত যত তৈরী হয়েছে, সেগুলো যত মানুষ মারতে পেরেছে, তার শতসহস্র গুণ মানুষ মেরেছে, এই সব ছোট, অতি ছোট জীবানুর দল। আবার, তাদেরই আর একদলের জন্যে, পৃথিবীর শস্য-শ্যামলা হচ্ছে, মানুষ সার পাচ্ছে, নানারকমের ওষুধপত্র তৈরী হচ্ছে, পৃথিবীর সমস্ত নোংরা জিনিস ভাল জিনিসে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

অতি তুচ্ছ বিষয়, অথচ তাই থেকে জগতের কত বড় বড় ঘটনা ঘটেছে। জগতের বহু শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার, শ্রেষ্ঠ কীর্তির মূলে আমরা অনেক সময় দেখতে পাই, রয়েছে একটা অতি নগণ্য ব্যাপার।

চায়ের কেটলীর ঢাকনির ওঠানামা দেখে জেমস ওয়াট বাষ্প-শক্তির সন্ধান জগতে দিয়ে গেলেন…বড় বড় কলকারখানার পেছনে রয়েছে, সেই সত্য ঘটনাটি।

গাছ থেকে প্রতিদিন কত ফল, কত ফুলই না ঝরে পড়ছে, কিন্তু তাই থেকে নিউটন সন্ধান পেলেন মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির।

একটুকরো পোকায়-ধরা কাঠ, তাই থেকে ব্রুনেল টেমস নদীর তলায় টানেল তৈরী করার সন্ধান পেলেন।

একটা সামান্য মাকড়সা নিজের মনে জাল বুনছিল, কে জানত, তাই দেখে একটা লোক তার জাতির মুক্তি এনে দিতে পারবে? অথচ, এমন এক লগ্নে সেই সামান্য জিনিসটা রবার্ট ব্রুসের চোখে পড়ল, এবং তা থেকে তিনি এমন প্রেরণা পেলেন যে, বারবার পরাজয়কে ঠেলে ফেলে দিয়ে তিনি আবার সৈন্যসংগ্রহ করে স্কটল্যাণ্ডের মুক্তি ফিরিয়ে আনলেন।

একথা আজ আর কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয় না যে, যাকে আমরা গৌরব করে বলি, বর্তমান সভ্যতা, তার মূলে রয়েছে ছাপাখানা। প্রাচীন পৃথিবী হ'ল, হাতে-লেখা পুঁথিপত্তরের যুগ, আর আমাদের বর্তমান যুগ হ'ল ছাপার হরফের যুগ। অথচ, এই ছাপার হরফ একদিন য়ুরোপে এক অতি সামান্য ব্যাপারকে আশ্রয় করে দেখা দিয়েছিল।

হল্যাণ্ডের হার্লেম শহরে লরেন্স কষ্টার বলে একজন লোক ছিলেন। ছোট ছোট নাতি-নাতনীদের অক্ষর পরিচয় করাবার জন্যে তিনি গাছের ছাল কেটে অক্ষর তৈরী করে একটা কাগজে মুড়ে বাড়ী নিয়ে

যাচ্ছিলেন। বাড়ী নিয়ে গিয়ে দেখেন, কাগজে কাঁচা ছালের রস লেগে এক-একটা অক্ষরের ছাপ বসে গিয়েছে। সেই থেকে 'ছাপার হরফ' বা 'টাইপ' তৈরী করবার কথা তাঁর মাথায় আসে এবং তিনি য়ুরোপে প্রথম ছাপাবার টাইপ তৈরী করেন!

এমনি ধারা কত সামান্য ঘটনা থেকে জগতের কত বড় বড় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে।

তুচ্ছ বলে যে সব জিনিস আমরা ফেলে দেই, তাই থেকে আজ বৈজ্ঞানিকেরা দেখাচ্ছেন যে, লক্ষ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। তাঁরা আজ কাঠের গুঁড়ো থেকে চিনি তৈরী করছেন, কাঠের গুঁড়ো জমিয়ে আস্ত কাঠও তৈরী করছেন।

মাছের আঁশ অতি তুচ্ছ জিনিস....মাছ কোটা হয়ে গেলে আমরা তা 'ডাষ্টবিনে' ফেলে দিই। অথচ সেই মাছের আঁশ থেকে বৈজ্ঞানিকেরা আজ নকল মুক্তো তৈরী করছেন এবং তা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা চলছে।

জগতের সবচেয়ে তুচ্ছ জিনিস হ'ল, মানুষের মল। কিন্তু সেই মল থেকে আজ লক্ষ লক্ষ টাকার সার তৈরী হচ্ছে। আমাদের দেশেই নানান জায়গায় আজ মানুষের মল থেকে এই ভাবে সার তৈরী হয় এবং লোকে তা পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে যায়।

সুতরাং ভগবানের এই রাজ্যে তুচ্ছ বলে কিছু নেই। বিধাতার সৃষ্টিতে অনাবশ্যক বলেও কিছু নেই।

—(*)—

নয়ে নব গ্রহ

আমরা ধারাপাতে পড়েছি, নয়ে নবগ্রহ। অর্থাৎ সূর্যের ন'টি গ্রহ আছে। সেই ন'টি গ্রহ হ'লঃ পৃথিবী, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লুটো। পৃথিবী ছাড়া বাকি আটটি গ্রহ সম্বন্ধে আমরা কতদূর জানি, তারি কথা এখানে বলা হচ্ছে।

তবে এ কথা গোড়াতেই তোমাদের বলে রাখছি, আমরা শুধু একটি গ্রহের খবরই ভাল করে জানি, সে আমাদের এই জন্ম-গ্রহ, পৃথিবী যার নাম। অন্য সব গ্রহ-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। তবে বৈজ্ঞানিকেরা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, এই মাটীর গ্রহ থেকে ঐসব লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের গ্রহের খবর জানবার জন্যে।

প্রথমে তোমাদের বলে রাখি কোন গ্রহ সূর্য থেকে কত দূরে—

বুধ	সূর্য	থেকে	৩৫,০০০,০০০	মাইল	দূরে
শুক্র	"	"	৬৬,০০০,০০০	"	"
পৃথিবী	"	"	৯৩,০০০,০০০	"	"
মঙ্গল	"	"	১৪০,০০০,০০০	"	"
জুপিটার	"	"	৪৮৩,০০০,০০০	"	"
শনি	"	"	৮৭০,০০০,০০০	"	"
ইউরেনাস	"	"	১৭৫৪,০০০,০০০	"	"
নেপচুন	"	"	২৭০০,০০০,০০০	"	"

প্রথমে বুধ-গ্রহের কথা ধরা যাক; কারণ, সে-ই সূর্যের সব চেয়ে কাছে। সকালবেলা ভোর হতে না হতে সূর্য থেকে ছিটকে আট

মিনিটের মধ্যে সূর্যের আলো আমাদের পৃথিবীতে এসে পড়ে, কিন্তু যখন সেই সূর্যের আলো প্রায় সাড়ে তিন মিনিটের পথ হেঁটে আসে, তখন প্রথম যে গ্রহে সে বিশ্রাম করে, তার নাম হ'ল,—বুধ।

আমাদের পৃথিবীতে সকাল হওয়ার মিনিট-পাঁচেক আগেই বুধ-গ্রহে সকাল হয়ে যায়। সূর্যের আলোর এত কাছাকাছি সে থাকে যে, আমরা তাকে খালি চোখে দেখতেই পাই না, এমন কি দূরবীক্ষণ-যন্ত্র দিয়েও সব সময়ে দেখতে পাওয়া যায় না।

আমাদের পৃথিবীতে বছর হয় ৩৬৫ দিনে, কিন্তু বুধ-গ্রহে বছর হয় মাত্র ৮৮ দিনে অর্থাৎ সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসতে বুধের ৮৮ দিন লাগে। যে-পথে বুধ সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, সে-পথটার আকৃতি সব সময় সমান থাকে না। সেই জন্যে বুধ-গ্রহ নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে মহা গোলমাল চলছে।

এক পথে চলতে চলতে হঠাৎ দেখা গেল যে তার চলার-পথটা একটু বেঁকে গিয়েছে···আবার কিছুদিন পরে দেখা গেল যে, সে সরে এসে ঠিক আগেকার পথে ফিরে এসেছে। কে যেন মাঝে মাঝে তাকে টেনে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে।

কেন এমন হয়, তাই নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে অনেক মতবাদ আছে।

একদল বৈজ্ঞানিক অনুমান করলেন যে, বুধের চেয়েও কাছে আর একটা গ্রহ, বোধ হয়, সূর্যের কাছাকাছি আছে, তারই আর্কষণে বুধের চলার পথ এই রকম ভাবে পরিবর্তিত হয়। লা ভেরিয়ে বলে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক সেই অদেখা গ্রহের একটা নামকরণ পর্যন্ত করে ফেলেছেন, তার নাম দেওয়া হয়েছে—“ভালকান”।

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-আইনের হিসেবে বুধের এই পথের গোলমালের হিসেব পাওয়া যায় না, কিন্তু আইনষ্টাইন যে Theory

of Relativity আবিষ্কার করেছেন, তাতে বুধের এই চরিত্রের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং সে-ব্যাখ্যা এত জটিল অঙ্কের মধ্যে আছে যে, তা এখানে উল্লেখ না করাই ভালো।

বুধ-গ্রহের অর্ধেক দিক সর্বদাই সূর্যের দিকে ফেরানো আছে। তার কারণ, ৮৮ দিনে অর্থাৎ যতদিনে সে একবার সূর্যকে ঘুরে আসে, সে নিজের মেরুর উপর একবার মাত্র আবর্তন করে। তাই তার অর্ধেক জগতে চিররাত্রি, বাকি অর্ধেক জগতে চিরদিন। যে অর্ধেকে চিরদিন, সেখানে দেখা গিয়েছে, অগ্নি-দগ্ধ দীর্ঘ সব পাহাড়ের চূড়া, কোন কোন চূড়া পৃথিবীর যে কোনও পাহাড়ের চূড়ার চেয়ে বড়, কিন্তু সেখানে প্রাণ নেই, কারণ, সেখানে জল নেই, জলের চিহ্ন মাত্র নেই···যেন একটা মৃত ধরণী।

যে-দিকে চিররাত্রি, সেদিকে কি আছে, তা বিজ্ঞানের অনুমানেরও বাইরে।

হাঁ, আর একটা কথা। বুধ হ'ল গ্রহদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট···তার ব্যাস হ'ল, প্রায় ৩০০০ মাইল।

কবিদের পাল্লায় পড়ে একটি গ্রহকে বড়ই বিপন্ন হতে হয়। অনেক সময় সূর্য যখন অস্ত যায়, তখন পশ্চিম-আকাশে একটা তারার মতন জিনিস টলটল করতে থাকে, তাকে কবিরা বলেন, "সন্ধ্যাতারা"। আবার কিছুদিন পরে সূর্যোদয়ের আগেই পূর্ব-আকাশে ফিকে অন্ধকারের মধ্যে তেমনি একটি তারা দেখা যায়, লোকে আদর করে তাকে বলে, "শুকতারা"। কিন্তু পশ্চিম-আকাশের সেই সন্ধ্যাতারা আর ভোরের সেই শুকতারা এক এবং অভিন্ন বস্তু,···এবং এটা মোটেই তারা নয়···এটা হ'ল একটা গ্রহ এবং সে-গ্রহটির নাম হ'ল শুক্র বা ভেনাস।

শুক্রের ব্যাস প্রায় পৃথিবীর সমান অর্থাৎ ৭৬০০ মাইল। শুক্র-গ্রহে বছর হয় ২২৫ দিনে অর্থাৎ সূর্যের চারিদিকে তার একবার ঘুরে আসতে ২২৫ দিন লাগে।

কিন্তু শুক্রকে অত উজ্জ্বল দেখায় কেন জান?

বুধে যেমন জল নেই, শুক্র গ্রহে কিন্তু জল আছে। জল থাকার দরুণ, পৃথিবীর মত সেখানে মেঘের স্তর আছে এবং বায়ুমণ্ডলও আছে। এই মেঘে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হওয়ার দরুণ, শুক্র সর্বদাই জ্বলজ্বল করে। জল-বাতাস থাকলেই সেখানে প্রাণীর থাকা সম্ভব, কিন্তু শুক্রের বায়ুমণ্ডল এত ঘন যে, তা ভেদ করে দূরবীক্ষণের দৃষ্টি এখনও সেখানকার বিশেষ কিছুই জানতে পারে-নি।

বৈজ্ঞানিকদের কাছে সব চেয়ে মজার গ্রহ হ'ল,—মঙ্গল। আমরা আশা করছি, মঙ্গল-গ্রহে হয়ত এই পৃথিবীর মত সব মানুষ আছে, এই পৃথিবীর মত সেখানে হয়ত একটা সভ্যতা আছে। কালে হয়ত সে মানুষ আমাদের সঙ্গে এক নতুনতর সম্বন্ধ স্থাপন করবে।

কিন্তু মঙ্গল-গ্রহে মানুষ থাকা সম্বন্ধে মানুষের মনে এই আশা কি করে জাগল?

মঙ্গল-গ্রহে জল আছে, সেখানে বায়ুমণ্ডলও আছে এবং এই বায়ু-মণ্ডল এত পাতলা যে, মঙ্গল-গ্রহের ভেতরকার চেহারা বৈজ্ঞানিকেরা খানিকটা খানিকটা দেখতে পেয়েছেন। মঙ্গল-গ্রহের যে-সব ফটোগ্রাফ নেওয়া হয়েছে, সেই সব ফটোগ্রাফের মধ্যে একটা বিচিত্র জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। সেই সব ফটোগ্রাফে লম্বা লম্বা দীর্ঘ সব লাইন পড়েছে…লাইনগুলি দেখলে বোঝা যায় যে, সেগুলি সত্যিকার লাইন নয়…কৃত্রিম। লাইনগুলি দেখে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করছেন যে, এগুলি সব দীর্ঘ খালের রেখা…এবং এই ব্যাপারটিই মানুষের মনে

আশা জাগিয়ে তুলেছে যে, যদি মঙ্গল-গ্রহের সেই রেখাগুলি খালের রেখা হয়, তা হলে নিশ্চয়ই সেখানে মানুষ আছে…কিংবা সে রেখাগুলো বনরেখাও হতে পারে।

আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, মঙ্গল-গ্রহে দিন প্রায় আমাদের মত…সেখানে ২৫ ঘণ্টা ১৭ মিনিট ২২.৬ সেকেণ্ডে দিন হয়। মঙ্গল-গ্রহের যে ম্যাপ তৈরী হয়েছে, তাতে সাগর, মরুভূমি, অরণ্য সমস্ত অনুমান করা হয়েছে। ঐ সমস্ত রেখা পর্যালোচনা করে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেছেন যে, শীতকালের পর সেখানে বরফ গলে গিয়ে নদীনালাগুলো ভরে ওঠে, তখন বসন্ত আসে এবং দিকে দিকে তখন সবুজ বনানী মাথা তুলে ওঠে…তাই আজ বৈজ্ঞানিকেরা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, এই পৃথিবীর কোন খবর মঙ্গল-গ্রহে পাঠান যায় কিনা…

বৃহস্পতি বা জুপিটার হ'ল গ্রহদের মধ্যে সব চেয়ে বড়। আমাদের পৃথিবীর মত ১৩৫০টা পৃথিবী তার দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়…এত বিরাট আর বিপুল তার দেহ! এই বিরাট দেহ নিয়ে বৃহস্পতি ঘণ্টায় ২০ হাজার মাইল বেগে আবর্তন করছে। কিন্তু সূর্যের চারদিকে সে খুব ধীরে ধীরে ঘুরছে, মাত্র সেকেণ্ডে আট মাইল। সেইজন্যে তার বছর হয় দীর্ঘ ৪৩৩২ দিনে।

আকারে অত বড় বটে, কিন্তু ওজনে সে অনুপাতে ঢের কম। বৃহস্পতির আপেক্ষিক গুরুত্ব পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ পৃথিবী যে-অবস্থায় এসেছে, বৃহস্পতি এখনও সে-রকম কঠিন অবস্থায় আসতে পারে-নি। সেইজন্য তাকে বলে semi-sun অর্থাৎ অর্ধ-সূর্য। এখনও তাহার বাষ্পময় দেহ কঠিন হয়-নি।

পৃথিবীর উপগ্রহ যেমন চাঁদ, তেমনি বৃহস্পতিরও চাঁদ আছে একটি নয়, ন' ন'টি। এই ন' ন'টি চাঁদ বৃহস্পতিকে ঘিরে ঘুরছে ঠিক আমাদেরই চাঁদের মত।

আয়তনের দিক থেকে বৃহস্পতির পরই শনি। শনিগ্রহের একটা প্রধান বিশেষত্ব হ'ল, তার চেহারা। সমস্ত শনি-গ্রহকে ঘিরে আছে, তিনটি জ্যোতির্ময় বলয়। কিসের এই বলয়?

অসংখ্য ছোট ছোট চাঁদ নিয়ে শনির এই বলয় গঠিত হয়েছে। অবশ্য এগুলো খুব ছোট, কোনটা ধূলোর মত, কোনটা বা নুড়ির মত। এগুলো যে কোথা থেকে কি-ভাবে শনি-গ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে, তার সঠিক খবর বৈজ্ঞানিকেরা আজও পর্যন্ত দিতে পারেন নি।

প্রথমে গ্যালিলিও তাঁর ছোট দূরবীক্ষণ-যন্ত্রটির সাহায্যে শনি-গ্রহের এই বলয় দেখতে পান।

এই তিনটি বলয় একত্রে প্রায় ৪০ হাজার মাইল চওড়া এবং একশো মাইল ঘন।

রবি বলে এক বৈজ্ঞানিক বলেন যে, কোন উপগ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়ে শনিকে এইভাবে বলয়াকারে ঘিরে আছে।

আগে লোকের ধারণা ছিল যে, ইউরেনাস একটা স্থির নক্ষত্র। বৈজ্ঞানিক হার্শেল প্রথম আবিষ্কার করলেন যে, ওটা নক্ষত্র নয়, ওটা গ্রহ, স্থির নয়, ঘুরছে, এবং তার নিজের কোন আলো নেই, সূর্যের আলোতেই তার আলো।

ইউরেনাসের বছর হয় আমাদের ৮৩ বছরে অর্থাৎ একবার সূর্যকে ঘুরে আসতে ইউরেনাসের ৮৩ বছর লাগে। ইউরেনাসের বারটি চাঁদ। ইউরেনাসের এই উপগ্রহগুলির একটু বিশেষত্ব আছে। অন্য সব

জ্যোতিষ্কের মত তারা পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘোরে না, তারা ঘোরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে।

নেপচুন আবিষ্কৃত হয়েছে এই সেদিন। প্রথম দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে তার অস্তিত্ব দেখবার আগেই, কাগজে-কলমে তার অস্তিত্বের খবর মানুষ পেয়ে গিয়েছিল। ইউরেনাসের সন্ধান পাওয়ার পর দেখা গেল যে, এত বড় জ্যোতিষ্ক মাঝে মাঝে কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ে। তখন বৈজ্ঞানিকেরা সন্দেহ করলেন যে, নিশ্চয়ই অন্য কোন বৃহত্তর গ্রহ তাকে আকর্ষণ করছে।

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র সর্বপ্রথম অঙ্ক কষে নেপচুনের স্থান-নির্দেশ করেন। ছাত্রটির নাম জন কাউর অ্যাডামস। তারপর জন গ্যালি বলে এক জার্মান বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর এই নতুন গ্রহটিকে দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়ে দেখেন। তাঁর মতে নেপচুনের ব্যাস হ'ল ৩৪,৮০০ মাইল এবং সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে তার ১৬৫ বছর লাগে।

সেদিন পর্যন্ত আমরা সূর্যের এই আটটি গ্রহের খবর জানতাম।

প্লুটো হ'ল সূর্যের নবম গ্রহ, কিন্তু তা আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ। প্লুটো সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবর আজ পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি, তবে জানা গিয়েছে যে, তার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসতে আমাদের ২৪৯ বছর লাগে। আয়তনে প্লুটো আমাদের পৃথিবীর চেয়ে কিছু ছোট।

আগে যারা ধারাপাতে 'নয়ে নবগ্রহ' পড়ত, তারা কি করে বলত ন'টা গ্রহ?

—(*)—

আকাশের অতিথি

অতিথি কাকে বলে জান তো ?

যার কোন তিথি নেই, অর্থাৎ কোন সময়ে আসবে-যাবে, কোন ঠিক নেই, তাকেই বলে অতিথি।

ধুমকেতু হ'ল আকাশের এক অতিথি। সে কোন্ সময় আমাদের সৌরজগতে দেখা দেবে, কোন্ সময় আবার চলে যাবে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

আকাশের যারা নিত্যকার-বাসিন্দা, চাঁদ, সূর্য, অসংখ্য তারা··· তাদের ছুবেলাই আমরা দেখতে পাই। কিন্তু ধূমকেতু দেখবার সৌভাগ্য সকলের ঘটে না, কারণ, ধূমকেতু তো আকাশের নিত্যকার-বাসিন্দা নয়···১৯১০ সালে সেই একটা ধূমকেতু উঠেছিল, আবার এই সেদিন একটা দেখা দিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হ'ল ধূমকেতু কি ?

খুব ছোট্ট করে উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়, ধূমকেতুগুলো অগঠিত নক্ষত্র। যে-সব নক্ষত্র আমরা দেখতে পাই, সেগুলো বাষ্প থেকে ক্রমশ শক্ত বস্তুতে পরিণত হয়েছে, কিন্তু ধূমকেতুগুলো এখনও বাষ্প অবস্থাতেই আছে।

একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে যে, ধূমকেতুর কথা বললেই মানুষ ভয় পায়, এবং মানুষের অনেক দিনের ধারণা এই যে, আকাশে ধূমকেতু উঠলেই পৃথিবীতে কোন অমঙ্গল হবে। কেউ কেউ ভাবে যে, ধূমকেতুর ধাক্কায় বুঝি আমাদের পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এ-সব ভয়-ভাবনার কোন কারণ নেই।

বিজ্ঞান অবশ্য ধূমকেতু-সম্বন্ধে এখনও অনেক কথাই জানে না, সে জানে না, কোথা থেকে এরা আসে, কোথায়ই বা আবার চলে যায়, কেনই বা এমন বিচিত্র চেহারা নিয়ে তারা মাঝে মাঝে নিশীথ-আতঙ্কের মত সৌর-জগতে দেখা দেয়।

ধূমকেতুর চেহারা তোমরা ছবিতে দেখতে পাবে। এদের চেহারা বড় বিচিত্র, যেন ধোঁয়ার একটা লম্বা নিশান। এদের আলো আর বাষ্পের একটা দীর্ঘ ল্যাজ থাকে, তাই সংস্কৃত ভাষায় এদের ধূমকেতু বলে। কেতু মানে হ'ল, লেজ। ইংরাজীতে এদের বলে, Comet. কথাটা এসেছে ল্যাটিন "Coma" থাকে। Coma মানে হ'ল, মাথার চুল। মাথার চুল বাতাসে এলিয়ে দিলে যেমন লম্বা হয়ে উড়তে থাকে, ধূমকেতুর দেহটা সেই রকম দেখায় বলে ইংরেজীতে একে বলে, Comet.

প্রত্যেক ধূমকেতুর দেহে তিনটে করে অংশ আছে। প্রথম হ'ল তার মাথার দিক, তাকে বলে Coma. এই মাথার দিকে মাঝামাঝি, কখনও একটা, কখনও দু' তিনটে তারার মতন জ্যোতির্ময় পদার্থ থাকে, তাকে বলে nucleus অর্থাৎ ধূমকেতুর যে অংশটা কিছু শক্ত বা যাতে কিছু বস্তু আছে। আর তার বাকি অংশটা হ'ল তার লেজ। এই লেজ লক্ষ লক্ষ মাইল লম্বা হয়। এত লম্বা হয় যে, মাঝে মাঝে সেটা পৃথিবী বা অন্য গ্রহের মধ্যে এসে পড়ে।

ধূমকেতু ঘুরতে ঘুরতে সৌর-জগতে সূর্যের টানে এসে পড়ে। যখন ধূমকেতুটা সূর্যের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, তার লেজের দিকটা তার মাথার দিকে পেছনে থাকে। তারপর সূর্যকে ঘুরতে ঘুরতে আবার যখন চলে যাবার পথে ফিরে, তখন তার লেজ ঘুরে যায়…অর্থাৎ তার লেজের দিকটা সূর্যের দিকে থাকে, মাথার দিকটা তার পরে থাকে।

এখন কথা হ'ল, ধূমকেতুগুলো কি দিয়ে তৈরী। তার মাথার দিকটায় কিছু বস্তু-পুঞ্জ আছে; অবশ্য সে-সব বস্তু-পুঞ্জ ঘন-বাষ্পের আবরণে ঢাকা। তবে বৈজ্ঞানিকেরা আজকাল বলেন যে, ধূমকেতুর মাথার অংশে যে-সব বস্তু-পুঞ্জ থাকে, তা খুব ছোট ছোট অনুর মত··· একটা পিনের মাথার মত ছোট ছোট জিনিস।

সুতরাং সে-সব বস্তু যদি কোন কারণে ছিটকে পড়ে, তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ, সেই সমস্ত ছোট ছোট টুকরো বাষ্প-স্তরের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতেই জ্বলে-পুড়ে যাবে। আমরা অনেক সময় আকাশে যে উল্কা-বৃষ্টি দেখি, তা এই সব ধূমকেতুর দেহ থেকেই আকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

লেজের অংশে যে সব বস্তু আছে, তা একেবারে অণু-পরমাণুর সামিল এবং সেখানে বাষ্প খুব পাতলা....যদিও ধূমকেতুর লেজ খুব লম্বা হয়। সবচেয়ে যার ছোট লেজ দেখা গেছে, তার লেজের দৈর্ঘ্য ছিল পাঁচ লক্ষ মাইল।

১৮৪৩ সালে যে বড় ধূমকেতু দেখা যায়, তার লেজের দৈর্ঘ্য ছিল ১৫৫ লক্ষ বাইল। কিন্তু তাতে কোন গ্রহের ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কারণ, এই লেজের অংশের বাষ্প এত পাতলা এবং তার ভার এত কম যে, সে যদি আমাদের পৃথিবী ছুঁয়েও যায়, তাহলে দূরবীণ-ধারী জ্যোতিষীরা ছাড়া আর কেউ জানতেও পারবেন না। বহুবার এ জিনিস প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।

আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা আকাশে প্রায় ১০০০ ধূমকেতুর সন্ধান পেয়েছেন। তবে তার সবগুলিই খালি চোখে দেখা যায় না। পাঁচটার মধ্যে একটা ধূমকেতু খালি চোখে দেখা যায়।

ধূমকেতুগুলোর এক একটা নাম আছে। যে যে-ধূমকেতু আবিষ্কার করে, তার নামে সেই ধূমকেতুর নামকরণ হয়। হেলি, মোরহাউস, বায়েলা, লেফেল, এনকি···এঁদের নামেই এঁদের-দেখা ধূমকেতুগুলির নামকরণ করা হয়েছে।

ধূমকেতুদের সম্বন্ধে আর একটা মজার ব্যাপার আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সৌর-জগতে একবার দেখা দিয়ে চলে যায়...আর আসে না। কেউ কেউ একটা নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে ফিরে আসে।

হেলি ১৬৮২ সালে যে ধূমকেতু দেখেন, সেই ধূমকেতুই হেলির ধূমকেতু নামে বিখ্যাত। এই ধূমকেতুটা প্রায় ৭৫ বৎসর অন্তর আকাশে দেখা যায়। এই হেলির ধূমকেতুই ১৯১০ সালের বৈশাখ মাসে আমরা দেখতে পাই। এই ধূমকেতুই প্রায় ৩ সপ্তাহ ধরে আকাশে ছিল, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়। এই হেলির ধূমকেতুর লেজ এত লম্বা ছিল যে, একদিন সেটা পৃথিবী আর সূর্যের মাঝামাঝি জায়গায় এসে পৃথিবীকে ঘিরে ফেলেছিল, কিন্তু তার ভার এত কম ছিল যে, আমরা তা টেরই পাইনি।

আবার, কোন কোন ধূমকেতু আছে, যেমন এনকির ধূমকেতু, তা প্রত্যেক সওয়া তিন বছর অন্তর আকাশে দেখা দিচ্ছে।

সুতারাং ধূমকেতু উঠতে দেখে, আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বরঞ্চ দেখা গিয়েছে যে, পৃথিবী বা অন্য গ্রহের সংস্পর্শে এসে বহু ধূমকেতুর দেহ টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। বায়েলার ধূমকেতু একবার সূর্য আর পৃথিবীর খুব কাছে এসে পড়ে। তার ফলে তার দেহ জরাসন্ধের মত দু'টুকরো হয়ে যায়!

—(*)—

ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড

বর্তমানকালে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ ব্রহ্মাণ্ডের যে পরিচয় পেয়েছে, তারই কথা আজ তোমাদের বলব।

প্রথমে আমাদের পৃথিবীর কথা ধরা যাক। আমাদের পৃথিবীর ব্যাস হ'ল ৮০০০ মাইল। তোমরা জান যে, আমাদের পৃথিবী হ'ল সূর্যের একটু গ্রহ। সূর্যের ব্যাস হ'ল ৭ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪ শো মাইল অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর মত ১৩ লক্ষটা পৃথিবীকে তাল পাকিয়ে এক জায়গায় করলে তবে একটা সূর্যের আয়তন হয়। সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবী ৯ কোটি ২০ লক্ষ মাইল দূরে আছে। যে পথ দিয়ে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, তাকে তার "অয়ন-পথ" বলে। এই অয়ন-পথের ব্যাস কত জান? ১৮ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল।

কিন্তু সূর্যের আরো সব গ্রহ আছে। সূর্য থেকে সকলের দূরে যে গ্রহটি আছে, তার নাম বরুণ, ইংরেজীতে বলে নেপচুন। বরুণের অয়ন-পথের ব্যাসের কথা ভাবলে মনে হয় যে, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর অয়ন-পথ একটা বড় গরুর গাড়ীর চাকার তুলনায় যেন একটা আধুলি। বরুণের অয়ন-পথ হ'ল, ৫৪৩ কোটী ৮০ লক্ষ মাইল।

তোমরা জেনে রাখ, আলোকরশ্মি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বেগে ছোটে। সেই বেগে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে ৮ মিনিট। তার জায়গায় বরুণ গ্রহে আলো পৌঁছোয় ৪ ঘণ্টায়। তাহলে বুঝতে পারছ যে, গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে সৌর-জগৎটা কত প্রকাণ্ড।

কিন্তু আমাদের এই পৃথিবী যেমন সৌর-জগতের একটা অংশ মাত্র, সৌর-জগৎটা হ'ল আবার তেমনি তার চেয়ে বড় আর এক জগতের সামান্য একটা অংশ।

যেমন কতকগুলি শহর নিয়ে একটা দেশ, কতকগুলি দেশ নিয়ে আবার মহাদেশ, আবার কতকগুলি মহাদেশ নিয়ে হ'ল আমাদের পৃথিবী...তেমনি সৌর-জগৎটা হ'ল আর একটা বিরাট বিশ্বের একটা অংশ মাত্র।

বৈজ্ঞানিকেরা সেই বিরাট বিশ্বের নাম দিয়েছেন—নক্ষত্র-জগৎ; ইংরাজীতে তাকে বলে—Stellar System.

অন্ধকার রাত্রিতে মাথার উপরে যে সব অসংখ্য তারা মিটমিট করে, তাদের মধ্যে ছ'সাতটা ছাড়া সবগুলিই একটা আলাদা আলাদা সূর্য। কোনটা সূর্য থেকে বড়, কোনটা বা সূর্য থেকে ছোট। এই অসংখ্য-সূর্য, যাদের আমরা নক্ষত্র বলি, তাদের নিয়েই হ'ল আমাদের নক্ষত্র-জগৎ।

বৈজ্ঞানিকেরা হিসেব করে দেখেছেন যে, খালি চোখে আমরা ৫০০০এর বেশী নক্ষত্র দেখতে পাই না...একই সময়ে এক নজরে ৫০০০ এর বেশী নক্ষত্র আমাদের খালি চোখে পড়ে না। কিন্তু সেই জায়গায় যদি একটা দূরবীণ ব্যবহার করা যায়, তাহলে হাজার হাজার নক্ষত্র আমাদের চোখে পড়ে।

কাউন্ট উইলসনের যন্ত্রাগারে একদিন যে বিরাট দূরবীণ দেখা গেল, তাতে কোটি তারা দৃষ্টিপথে পড়ে। সে দূরবীণেও দেখা যায় না, এমনও বহু তারা আছে। এক রকম বৈজ্ঞানিক আলোক-চিত্রের সাহায্যেই তাদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। নানাভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অবশ্য আজ শতশত কোটি তারা মানুষের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

সেই সমস্ত তারা নিয়ে নক্ষত্র-জগৎ যে কি প্রকাণ্ড, তা সাধারণ অঙ্ক দিয়ে বোঝানো যাবে না।

পৃথিবী থেকে সূর্য হ'ল, ৯ কোটি ৮০ লক্ষ মাইল দূরে। পৃথিবীর নিকটতম যে তারা, সে থাকে পৃথিবী থেকে ২৭ লক্ষ কোটি মাইল দূরে। তাই সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়েও জোনাকীর মত মিটমিট করে।

তারাগুলো পৃথিবী থেকে কত দূরে আছে, তা বোঝাবার জন্যে আগেই বলেছি সাধারণ অঙ্কের হিসেব চলে না। সেইজন্যে দূরত্ব মাপবার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিকেরা এক নতুন মাপ ঠিক করেছেন।

আমরা যাকে ছায়াপথ বলি, সে হ'ল অতি দূরবর্তী অসংখ্য তারার সমষ্টি। দূর থেকে যেমন একটা প্রকাণ্ড ধানক্ষেত একটানা সবুজ দেখায়, সেখানে যে আলাদা আলাদা ধানের শীষ আছে, তা মনে হয় না, তেমনি কল্পনাতীত দূরে থাকার দরুণ, সেই অসংখ্য তারকা-সমষ্টিকে মনে হয় খানিকটা একটানা সাদা রঙের ছোপ। সেই ছায়াপথে যে সব তারা আছে, তাদের দূরত্ব বৈজ্ঞানিকেরা আলোক-বর্ষ (আলোক আসার পথ) দিয়ে হিসেব করেন। এক আলোকবর্ষ হ'ল, ৬ লক্ষ কোটি মাইল। আমাদের পৃথিবী থেকে ছায়াপথের দূরত্ব হ'ল, এই রকম ৪ হাজার আলোকবর্ষ।

আগেই তোমাদের বলেছি যে, ১৩ লক্ষটা পৃথিবীকে তাল পাকিয়ে একজায়গায় করলে একটা সূর্যের আয়তন হয়। আবার "বিটেলজুস" নামে একটা তারা আছে, তার আয়তন শুনিলে অবাক্ হতে হয়। আড়াই কোটি সূর্যকে তাল পাকিয়ে একত্র করলে একটা বিটেলজুস তারার আয়তনের সমান হয়।

এই তো গেল একটা বিশ্বের খবর। আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, মহাশূন্যে এমনি আরও বহু বিশ্ব আছে। আমাদের বিশ্বের প্রান্তভাগ থেকে দূরবীণে মহাশূন্যে টুকরো মেঘের মত যা দেখা যায়, সেগুলোকে সাধারণতঃ আমরা "নীহারিকা" বলি। এই সব নীহারিকা হ'ল বিশালকায় বিশ্ব।

কোন নীহারিকায় একটা বিশ্ব গড়ে উঠেছে, কোনটায় হয়ত আধখানা গড়ে উঠেছে, কোনটায় হয়ত এখনও একটা বিশ্ব বাষ্পাকারে তীব্রবেগে ঘুরছে। এক একটা নীহারিকাতে এত পদার্থ আছে, যে, তা থেকে ১০০ কোটি সূর্য তৈরী হ'তে পারে।

"এণ্ড্রোমেডা" রাশির নীহারিকা পৃথিবী থেকে কত দূরে জান? ১০ লক্ষ আলোকবর্ষ!

এ পর্যন্ত দূরতম যে-নীহারিকার অস্তিত্ব ধরা পড়েছে, তা ১৪ কোটি আলোকবর্ষ দূরে আছে!

আজকাল বৈজ্ঞানিকরা বলেন, এর পরেও দেশ আছে। তার নাম দিয়েছেন তাঁরা—Island Universe. এই সমস্ত নিয়ে হ'ল—ব্রহ্মাণ্ড. ইংরেজীতে তাকে বলে—Universe.

—(*)—

পূবের কাছে পশ্চিমের ঋণ

তোমরা জান যে, য়ুরোপের লোকেরা সাধারণতঃ এশিয়া এবং উত্তর-আফ্রিকার লোকদের পূব-দেশের লোক বলে। তারা নিজেরা হ'ল পশ্চিম-দেশের লোক। এইভাবে মানবসমাজে 'পূব' আর 'পশ্চিম' নামে দুইটি বিভিন্ন ভাগের সৃষ্টি হয়েছে। এই পূব-জগতের সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিম-জগতের সভ্যতার অনেক পার্থক্য আছে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত পশ্চিমের লোকেরা মনে করত যে, সভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তা পশ্চিম-জগতেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দেশ-বিদেশের পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে প্রমাণ হয়েছে যে, মানবসভ্যতার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ সম্পদ পশ্চিম-জগৎ পূব-জগতের কাছ থেকেই পেয়েছে।

এই যে আমরা কথা বলছি, বই লিখছি, নিজের মনের কথা লিখে অন্য পাঁচজনকে জানাচ্ছি, যা আমার এই দেহের মৃত্যুর পরও হয়ত হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকবে, আমরা কি ভেবে দেখেছি, তা কেমন করে সম্ভব হ'ল?

অথচ যে জিনিসের আবিষ্কারের দ্বারা তা সম্ভব হয়েছে, সে হ'ল অক্ষর-সৃষ্টি। বলা যেতে পারে, এই অক্ষর-সৃষ্টির মত কোন বড় আবিষ্কার মানুষ আর করেনি।

এই অক্ষর-সৃষ্টি হ'ল মরণশীল মানুষের প্রথম এবং একমাত্র অমরত্বের সার্থক প্রয়াস। কিন্তু কোথায় কবে কোন মানুষের দল এই অক্ষরের প্রথম সৃষ্টি করল?

ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, সবপ্রথম মিশরে এক রকম সাঙ্কেতিক লেখার চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়। ছবি এঁকে তখন মানুষ মনের কথা প্রকাশ

করত। আজও নিরক্ষর মানবদের মধ্যে ছবি এঁকে মনের কথা প্রকাশ করার প্রথা আছে। সেই সাঙ্কেতিক অক্ষরকে পণ্ডিতেরা নাম দিয়েছেন—"হেয়ার-ও-গ্লিফিক্স"।

অবশ্য এই ধরণের ছবি এঁকে সব কথা প্রকাশ করা যেত না। তখন স্বভাবতই মানুষ অন্য কোন চিহ্ন-আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগল, যার সাহায্যে সে তার মনের সব কথাই সহজে প্রকাশ করতে পারে। ক্রমশ এই চেষ্টার ফলে ধনুকের তীরের ফলার মত আর এক রকম নতুন অক্ষরের সৃষ্টি হয়। ধনুকের তীরের ফলার মত দেখতে বলে পণ্ডিতেরা তার নাম দিয়েছেন—'কিউনিফর্ম'। এই অক্ষরসৃষ্টি হয়, কারুর মতে মিশরে, কারুর মতে আসিরিয়াতে। এই দুই জায়গাই হ'ল—পূব-জগতে।

এই কিউনিফরম অক্ষর থেকে ক্রমশ উন্নত ধরণের অক্ষর তৈরী হতে লাগল। ফিনিসিয়ার বণিকরা মিশরবাসীর কাছ থেকে সেই অক্ষর শেখেন। আবার তাঁদের কাছ থেকে পশ্চিম-জগতের গ্রীকরা শেখেন। এই ভাগে ক্রমশ পশ্চিম-জগতে অক্ষরের প্রচলন হয়।

অক্ষর-সৃষ্টির পরই আসছে—লেখার কথা। মনের কথা লিখে না রাখতে পারলে স্থায়ী হয় না। আদিম মানুষের কাছে তখন এক মস্ত বড় সমস্যা দাঁড়াল···কিসের উপর লেখা হবে? তখন তো কাগজ ছিল না!

প্রথমে মানুষ পাথরে, গাছের ছালে, চামড়ার উপর লিখতে আরম্ভ করল। কিন্তু সর্বদাই সে খোঁজ করতে লাগল, কি উপায়ে এমন একটা জিনিস তৈরী করা যেতে পারে, যা সহজে নষ্ট হবে না, অথচ নাড়াচাড়া বা ব্যবহার করতেও কোন অসুবিধে হবে না।

এই সমস্যা দূর করবার জন্যে মিশরে সবপ্রথম এক রকম পাতলা কাগজের সৃষ্টি হয়। নীল নদের ধারে ধারে প্যাপিরাস বলে এক রকম

শরের গাছ আছে। সেই শরের ডাঁটাগুলিকে ছেঁচে পিটিয়ে, মাদুরের মতো এক রকম জিনিস তৈরি করা হত, এবং তারই ওপর লেখা হত। লেখার পর সেই মাদুর গুটিয়ে রোল (roll) করে রাখা হত। বহু শতাব্দী ধরে সেই প্যাপিরাস কাগজই সমগ্র জগতে প্রচলিত ছিল।

গ্রীসের লোকেরা সেই প্যাপিরাস কাগজকে বলত "বিবলস"; ক্রমশ প্রাচীন গ্রীক ভাষায় বিবলস কথাটার মানে দাঁড়িয়ে গেল "বই" এবং এই বিবলস কথা থেকেই ইংরেজী "বাইবেল" কথার উদ্ভব হয়েছে; সেইজন্যে বাইবেল কথাটার আসল মানেও হচ্ছে—"দি বুক", অর্থাৎ সেই (চিহ্নিত অর্থাৎ বিশিষ্ট) বই।

তারপরে এল বর্তমানে আমরা যে কাগজ ব্যবহার করি, তাই। সেও এল পূবজগৎ থেকে। চীনদেশের লোকেরাই সবপ্রথম কাগজ তৈরী করতে শেখে এবং তাদের কাছ থেকে শিখে নিয়ে অন্য সব দেশ কাগজ ব্যবহার করতে থাকে। তোমরা শুনলে হয়তো বিস্মিত হবে যে, যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর পর আট শ' বছর পর্যন্ত য়ুরোপে এক টুকরো কাগজ ছিল না।

৭৫১ খৃষ্টাব্দে সমরকন্দের শাসনকর্তার সঙ্গে চীনাদের এক যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে আরববাসীরা যে সব চীনাকে বন্দী করে আনে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাগজ তৈরী করতে জানত। সেই বন্দীদের কাছ থেকে আরববাসীরা কাগজ তৈরী করতে শেখে। আরববাসীদের কাছ থেকে আবার পশ্চিমের লোকেরা কাগজ-তৈরী করার বিদ্যা শেখে।

তারপর আসে—ছাপার কথা। আলাদা টাইপের সাহায্যে বর্তমান ছাপাবার-রীতি পশ্চিম-জগতে প্রচলিত হয়েছে মাত্র পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তার বহুপূর্বে চীনদেশে স্বতন্ত্র টাইপের সাহায্যে ছাপার প্রণালী আবিষ্কৃত হয়। পশ্চিম-জগতে স্বতন্ত্র টাইপের সাহায্যে ছাপাবার রীতি

যাঁরা সবপ্রথম আবিষ্কার করেন, সেই দু'জনের মধ্যে একজন হলেন হল্যাণ্ডের লরেন্স কষ্টার, আর একজন হলেন জার্মানীর গুটেনবার্গ— তাঁরা দুজনেই হলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক।

কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় যে, অষ্টম শতাব্দীতে চীনে কাঠের টাইপের সাহায্যে অতি উৎকৃষ্ট ছাপার কাজ হচ্ছে। কাঠ-খোদাই করে ছাপার রীতি পশ্চিম-জগতে প্রচলিত হয়েছে মাত্র পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তার বহু পূর্বে চীনদেশে স্বতন্ত্র টাইপের সাহায্যে ছাপানোর প্রণালী আবিষ্কৃত হয়। প্রথম আবিষ্কর্তার নাম ফেঙ-টাও। তিনিই পৃথিবীর প্রথম মুদ্রাকর।

স্যার অবেল-ষ্টাইন ছিলেন একজন বড় ঐতিহাসিক এবং প্রত্নবিৎ। মধ্য-এশিয়ার মরুভূমির ভেতর থেকে তিনি বহু-প্রাচীন সভ্যতার অমূল্য নিদর্শন খুঁড়ে বা'র করেন। তার মধ্যে কতকগুলি প্রাচীনকালে ছাপানো চীনা কাগজ-পত্র তিনি পেয়েছেন। সৌভাগ্যবশত চারখানি ছাপানো কাগজে তারিখ পর্যন্ত দেওয়া ছিল। সেগুলির মধ্যে যেটির তারিখ সব চেয়ে বেশী প্রাচীন, সেটি হচ্ছে ৮৬৮ খৃষ্টাব্দের। ষোল ফিট লম্বা একটা কাগজ···তাতে বৌদ্ধধর্মের কথা লেখা আছে। সেই সঙ্গে একটি ছবিও ছাপানো আছে। ছবিটির ছাপানো এত সুন্দর এবং নিখুঁত যে, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, সেই রকম পারদর্শিতা অর্জন করতে অন্তত আরও একশ' বছর সময় লেগেছিল।

এক সময় চীনদেশ থেকে বৌদ্ধধর্মের নানা মন্ত্র ছোট কাগজে ছাপানো হয়ে জাপানে যেত। জাপানের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় যে, ৭৭০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশ থেকে দশলক্ষ এই রকম মন্ত্র কাগজে ছাপান হয়ে জাপানে আসে। সম্প্রতি সেই মন্ত্র-ছাপানো একখানি কাগজ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বৃটিশ মিউজিয়ামে তা সংরক্ষিত হয়েছে। সেই কাগজের

টুকরোটুকুই হ'ল আজ পর্যন্ত জগতের সব চেয়ে পুরানো ছাপার কাগজের নিদর্শন।

তারপর ধর—বিজ্ঞানের কথা। বহু বিজ্ঞানের প্রথম মূলসূত্র একদা এই পূব-জগতেই আবিষ্কৃত হয়। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, অঙ্ক না শিখলে বিজ্ঞান শেখা যায় না। ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্কের চিহ্নগুলির জন্ম হয়েছিল, ভারতবর্ষে; এবং ইংরাজীতে যাকে বলা হয় "ডেসিম্যাল ফ্রাকশন", আর বাঙলায় যাকে আমরা বলি "দশমিক ভগ্নাংশ", তাও প্রথম ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়।

"য়্যালজেব্রা" বা বীজগণিত-ও আমাদের কাছ থেকে আরবেরা শেখে, তারপর আরবদের কাছ য়ুরোপের লোকেরা শেখে। শ্রীধরাচার্য বলে প্রাচীন ভারতে বীজগণিতে অসাধারণ পণ্ডিত এক লোক ছিলেন। তাঁর অঙ্ক কষবার প্রণালী আজও তাঁর নামে জগতে প্রসিদ্ধ। আর্য-ভট্টকে সাধারণত উচ্চ বীজগণিতের জন্মদাতা বলা হয় ৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পাটুলিপুত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরই বই থেকে আরব দেশের পণ্ডিতেরা সংখ্যা-গঠন-প্রণালী ও বীজগণিত আয়ত্ত করেন।

বিখ্যাত খলিফা মনসুরের রাজত্বকালে (৭৭৩ খৃঃ) অঙ্কশাস্ত্রে একজন মস্তবড় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম হ'ল মুসা। মুসার বীজগণিত থেকে য়ুরোপ সবপ্রথম বীজগণিতের দীক্ষা পায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে লিওনার্দো পিসানো বলে একজন ইতালী দেশের লোক আরবে বাস করে বীজগণিত শিক্ষা করেন। ইতালীতে ফিরে গিয়ে তিনি য়ুরোপে প্রথম বীজগণিতের প্রাথমিক বই লেখেন। ইতালীতে যে সময় পিসানো বীজগণিতের বই লিখছিলেন, সেই সময় ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিড়গ্রামে ভাস্কারাচার্য বীজগণিতের বড় বড় সব সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর বীজগণিতের নাম হ'ল, "লীলাবতী"। মাটি খুঁড়ে

পিরামিডের ভেতর থেকে প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া গিয়াছে। পিরামিডের ভেতর থেকে যিশুখৃষ্ট জন্মাবার দু' হাজার বছর আগেকার এক অঙ্কের বই পাওয়া গিয়াছে। সেই বইখানা সযত্নে বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

জ্যামিতির জন্ম নিয়ে দুটো মত আছে। কেউ বলেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে জ্যামিতির প্রথম জন্ম হয়, কেউ কেউ আবার বললেন প্রাচীন মিশরে। এ দুটোর যেটাই সত্যি হোক, আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, জ্যামিতির উদ্ভব হয়েছিল প্রথমে এই পূবজগতেই। আমাদের চারটি বেদের মধ্যে যজুঃ একটি, এই যজুর্বেদে যজ্ঞভূমি এবং পূজার দেবী তৈরী করবার জন্যে প্রথম জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার উল্লেখ ও প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। প্রাচীন মিশরে নীল নদের বন্যায় নদীর দু'ধারের জমির সীমানা প্রায়ই ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যেত। বন্যা থেমে যাবার পর সেইজন্যে প্রায়ই জমির সীমানা নিয়ে ভীষণ ঝগড়া-ঝাঁটি হ'ত। সেই সব জমি আগে থাকতে নিখুঁতভাবে মেপে রাখবার জন্যেই প্রাচীন মিশরে জ্যামিতির উৎপত্তি হয়।

রসায়ন-বিজ্ঞানেরও জন্মভূমি হ'ল পূব-জগৎ। প্রাচীন মিশরের কবর খুঁড়ে যে সব জিনিস পাওয়া গিয়াছে, তাদের রঙের কাজ দেখে আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরাও বিস্মিত হয়ে গিয়েছেন। কোন কোন জিনিসের রঙ দেখলে মনে হয়, যেন কালই সবেমাত্র রঙ লাগিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। রসায়নের কতখানি জ্ঞান থাকলে যে তা সম্ভব হতে পারে, অনায়াসেই তা অনুমান করা যায়। মিশরের গাছ-গাছড়ার দেবতার নাম হ'ল—"ক্ষেম"। অনেক পণ্ডিতের অনুমান যে য়ুরোপের "কেমিষ্ট্রী" কথাটা এই "ক্ষেম" কথা থেকেই তৈরী হয়েছে।

ডাক্তারী বিদ্যায়ও পূব-দেশ হ'ল পশ্চিমের গুরু। কিছুদিন হ'ল মিশরের মাটির ভিতর থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগেকার একখানি প্রাচীন যুগের একটি ছবি পাওয়া গিয়াছে। তাতে দেখা যায় যে, একজন ডাক্তার এক রোগীকে অস্ত্রোপচার করছেন।

গ্রীসে দু'জন খুব বড় ডাক্তার ছিলেন। একজনের নাম ইসকিউলে-পিয়াস, আর একজনের নাম হ'ল হিপোক্রেটিশ। য়ুরোপের লোকের ধারণা যে, তাঁরাই হলেন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতির জনক। কিন্তু আজকাল য়ুরোপের সে ভুল ধারণা কেটে যাচ্ছে। কর্ণেল গ্রীনআর্মি-টেজের নাম বোধ হয় অনেকের শোনা আছে। তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে একজন বিখ্যাত ডাক্তার এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের নাম-জাদা অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর মতে, হিপোক্রেটিস জন্মাবার অন্তত এক হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে অত্যুৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল।

ভারতের চরক আর সুশ্রুতের নাম নিশ্চয়ই অনেকের শোনা আছে। তাঁরা দুজনে হলেন জগতের আদি চিকিৎসক। সুশ্রুত হলেন, অস্ত্রচিকিৎসার জনক। অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি নিজে ১২৫টি বিভিন্ন যন্ত্র তৈরী করে গিয়েছিলেন। আজকাল পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন যে চিকিৎসা-ব্যাপারে সুশ্রুতের অস্ত্রই জগতের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করে।

জ্যোতিষ-সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞান পশ্চিম পূবের কাছ থেকে পেয়েছে। আজকাল সভ্য-জগতের সর্বত্র সৌরবর্ষ প্রচলিত আছে অর্থাৎ ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় বছর ধরা হয়। বৈদিক কালেও হিন্দুরা সৌরবর্ষ হিসাবে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় বছর গুণতেন—যা আজকাল আমরা করি। এই সৌরবৎসর যিশুখৃষ্টের জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরে আবিষ্কৃত হয়।

যাঁকে নিয়ে পশ্চিমের ধর্ম, সেই যিশুখৃষ্ট, তিনিও পূব-জগতের দান। এই পূব-দেশেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, খৃষ্ট, য়িহুদী—সকল ধর্মের জন্মভূমি হ'ল এই পূবদেশ।

ব্যবহারিক দিক দিয়েও পূবজগৎ একদা এমন সব জিনিসের সৃষ্টি করেছিল, যা আজ পূব ও পশ্চিম জড়িয়ে মানব-সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। সকল ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলে রয়েছে মুদ্রা, যাকে আমরা বলি টাকা, আধুলি ইত্যাদি। কিন্তু চিরকাল এই রকম মুদ্রার চলন ছিল না। এক সময় মানুষ বিনিময়-ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বেচা-কেনা করত। যার গরু আছে, সে গরুর বদলে ধান কিনত; যার ধান আছে, সে ধান দিয়ে কাপড় কিনত। তাকেই বলত বিনিময়-প্রথা। এই বিনিময়-প্রথার অসুবিধা অনেক। তাই মানুষ মুদ্রার সৃষ্টি করল। পশ্চিমের ঐতিহাসিকেরাই বলেন যে, মধ্য-এশিয়ার লিডিয়া দেশের বণিকেরাই সবপ্রথম মুদ্রা তৈরী করেন। লিডিয়ার বণিকদের কাছ থেকে গ্রীকরা মুদ্রা ব্যবহার করতে শেখে।

আজকালকার নিত্য-প্রয়োজনের অনেক ছোটখাট জিনিস প্রথম পূব-দেশ থেকেই পশ্চিমে গিয়েছে। এই যে 'ছাতা' আজকাল সারা জগতে যার ব্যবহার চলছে—এও আমাদের দেশ থেকেই য়ুরোপে যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক চীনদেশ থেকে একটা ছাতা ইংলণ্ডে নিয়ে আসেন।

চা না হলে আজকাল একদিনও চলে না। এই চা-ও চীনদেশে থেকে পশ্চিমে যায়। প্রথম যখন য়ুরোপে চা গিয়ে পৌঁছোয়, তখন চা-তৈরী করতে না জানার ফলে, সে দেশে অনেক মজার মজার ব্যাপার ঘটত। অনেক লোক গরম জলে চা'র পাতা সিদ্ধ করে, গরম জলটা ফেলে দিয়ে চিনি মাখিয়ে পাতাগুলো খেতে চেষ্টা করেছিল।

যাই হোক, যুগের পর যুগ ধরে পশ্চিম পূবের কাছ থেকে অনেক জিনিস নিয়েছে। তার জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের গায়ে আমাদের এই পূব-জগতের পাঁচটা আঙুলের চিহ্ন এমন ভাবে আছে যে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কালক্রমে পূব-জগতের জীবন-ধারার গতি ম্লান ও শ্লথ হয়ে এল। তার বিজয়রথের চাকা একে একে ভেঙ্গে সব পড়ে গেল …পথের একধারে পুরাকালের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ পড়ে রইল সে রথ… তারপর…ক্রমশ…যুগ-যুগান্তরের ধূলোয় ধূলোয় ছেয়ে গেল রথের দেহ…সে যে একদিন ছিল, তা-ও লোকে গেল ভুলে…একদিন যে ছিল দাতা, সে আবার ভিখারী হয়ে দাঁড়াল, একদিন যাকে দিয়েছে, তার দ্বারে…

—(*)—

হঠাৎ

জগতে হঠাৎ অনেক বড় জিনিস ঘটে গিয়েছে। অনেক অসম্ভবের সন্ধান, আজীবন খুঁজেও মানুষ যা বের করতে পারেনি···হঠাৎ একদিন না খুঁজতেই তার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ সাধনা করছে···ধর, কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব খুঁজে বের করবার জন্যে···কিছুতেই ঠিক পথের দিশা পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল, যার সঙ্গে হয়ত আসল ব্যাপারের কোনও যোগ নেই, কিন্তু তারই মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল, এতদিন এত যুগযুগান্তর ধরে যে তত্ত্বের সন্ধান আমরা পাচ্ছিলাম না, তারই খবর।

অন্ধকার ঘর, তার মধ্যে দোর-জানালা বন্ধ, বাইরেও নেই সূর্য, হঠাৎ ঘরের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য কে আলো জ্বালিয়ে দিল। সেই আলোটুকুতেই হারানো জিনিসের সন্ধান মিলে গেল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে এমনিতর হঠাৎ আলো কে জ্বালায়, তার খবর আমরা জানি না, কিন্তু মানুষের ইতিহাসে বার বার দেখেছি, এমনি হঠাৎ আলো জ্বলে উঠেছে এবং যেদিক দিয়ে পথ খুঁজে পাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, হঠাৎ সেদিক দিয়েই পথ দিল দেখা···এখানে সেই রকম দু'একটি বড় ঘটনার কথা তোমাদের বলব।

অবশ্য এ থেকে তোমরা মনে করো না যে, আমি বলছি, সেই সব বড় বড় জিনিস দৈবের সাহায্যে ঘটেছে। মোটেই তা নয়। মানুষের শ্রম আর প্রতিভা ষোল-আনাই দরকার হয়েছে···তবে যে পথে গেলে সেই শ্রম সার্থক হয়ে উঠবে, তার ইঙ্গিত হঠাৎ এমন সব জায়গা থেকে এসেছে, যা ভাবাই যায় না।

এক

ডাক্তার বলে গেলেন, অসুস্থ স্ত্রীকে ব্যাঙের ঝোল খাওয়াতে। সেই ব্যাপার থেকে কে জানত যে, বৈদ্যুতিক তত্ত্বের খবর পাওয়া যাবে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ যাকে খুঁজে পায়নি···ব্যাঙের ঝোল তৈরী করতে গিয়ে হঠাৎ সেদিন এক অদ্ভুত উপায়ে তার খবর পাওয়া গেল।

ইতালীতে লুইগী গ্যালভিনি বলে শরীরতত্ত্বের একজন অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর স্ত্রীকে তিনি খুব ভালবাসতেন। একবার তাঁর স্ত্রীর কঠিন পীড়া হয় এবং ডাক্তার এসে বলে যান যে, প্রত্যহ রোগীকে যেন ব্যাঙের ঝোল খাওয়ান হয়। বাজারে কয়েকদিন ব্যাঙ পাওয়া গেল না। নিরুপায় হয়ে তাঁর ল্যাবরেটরীতে যে সব ব্যাঙ কাটা হ'ত, তাই তিনি স্ত্রীর জন্যে নিয়ে যেতেন।

একদিন গ্যালভিনি উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর একজন ছাত্র সেদিন ব্যাঙ নিয়ে আসবার জন্যে ল্যাবরেটরী-ঘরে গিয়ে যেই ছুরি দিয়ে ব্যাঙটাকে ছুঁয়েছে···অমনি হঠাৎ দেখা গেল, মরা ব্যাঙের পা-টা নড়ে সোজা হয়ে উঠল। মরা ব্যাঙকে সেইভাবে নড়তে দেখে ছাত্রটির ভয়ানক কৌতূহল হ'ল।

তখনি গ্যালভিনির কাছে সংবাদ গেল। গ্যালভিনি এসে বহু পরীক্ষার পর দেখলেন যে, টেবিলে বিদ্যুৎ তৈরী করবার বড় একটা যন্ত্র ছিল। (সে সময় চাকা ঘুরিয়ে পশম ঘসে সামান্য বিদ্যুৎ তৈরী করা হ'ত মাত্র। বেশী করে বিদ্যুৎ তৈরী করে কি-ভাবে মানুষের কাজে লাগান যায়, তা তখন কারুরই জানা ছিল না।) হঠাৎ সেই ছুরির সঙ্গে সেই বিদ্যুৎ-তৈরী-করা-যন্ত্রটি এবং ব্যাঙের দেহ একই সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ফলে ব্যাঙের পা ঐ-রকম ভাবে নড়ে উঠেছে।

এই ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করে গ্যালভিনি স্থির করলেন যে,

জীবদেহে এক রকম বিদ্যুৎ আছে এবং ইতালীর বৈজ্ঞানিকদের সামনে তিনি তাঁর এই নতুন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন। তাঁর এই গবেষণার পর বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু গ্যালভিনি পদার্থবিদ্যা ভাল জানতেন না। তিনি ছিলেন শরীরতত্ত্বের অধ্যাপক।

সেই সময় একজন কবি কাব্যচর্চা ছেড়ে দিয়ে পদার্থবিদ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। বহুদিন ধরে তিনি নীরবে গবেষণা করেছিলেন, কি করে অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-প্রবাহ তৈরী করা যায়। তাঁর নাম হ'ল, আলেকজান্দ্রো ভোল্টা।

গ্যালভিনির এই নতুন তত্ত্বের কথা ভোল্টার কানে গিয়ে পৌঁছোল। গ্যালভিনির এই ভুল গবেষণা শুনে হঠাৎ তিনি তাঁর পথ খুঁজে পেলেন। বিদ্যুৎ ব্যাঙের দেহে ছিল না···দুটো বিভিন্ন ধাতু-খণ্ডের সংস্পর্শে বিদ্যুৎ ব্যাঙের দেহে সঞ্চালিত হয়েছে···ব্যাঙের শিরা-উপশিরা শীঘ্রই উত্তেজিত হয় বলে সেটা কেবল তড়িৎ-নির্দেশকের কাজ করেছে।

ভোল্টা গ্যালভিনির তত্ত্ব প্রতিবাদ করলেন। সকলের সামনে তিনি তাঁর গবেষণা পরীক্ষা করে দেখালেন। ব্যাঙের দেহ বা অন্য কোনও জীবের দেহ তিনি নিলেন না। তার বদলে এ্যাসিডে-ভেজানো একটা ন্যাকড়া ব্যবহার করলেন। দস্তা আর তামার দুটো পাত সেই এ্যাসিডে-ভেজানো ন্যাকড়া দিয়ে সংযুক্ত করে দেখালেন যে, তাতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সেই পরীক্ষার ফলে গ্যালভিনির তত্ত্ব মিথ্যে বলে প্রমাণিত হ'ল এবং জগতে বিদ্যুৎ-তত্ত্বের নবযুগের সূত্রপাত হ'ল। এর পরে ভোল্টা আবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করবার উপায় আবিষ্কার করলেন।

ভোল্টার এই যন্ত্রসৃষ্টির পর থেকে, মানুষের মনে বিশ্বাস এল যে, বিদ্যুৎকে মানুষের কাজে লাগানো যেতে পারে। অবশেষে ইংলণ্ডে মাইকেল ফ্যারাডে এসে বিদ্যুৎকে নিয়ে মানুষের প্রয়োজনের কাজে

লাগালেন। তিনিই হলেন, ইলেকট্রিক্যাল সায়েন্সের জন্মদাতা, যাঁর উদ্যমে আজ মানুষ বিদ্যুৎকে "জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ" পর্যন্ত সব কাজে লাগাতে পারছে।

যখন বৃটিশ পার্লামেণ্ট মাইকেল ফ্যারাডে তাঁর বিদ্যুৎ-তত্ত্বের কথা প্রথম প্রকাশ করলেন, তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোনের মত লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু এ থেকে আমাদের কি লাভ বলুন? এ রকম ছেলেমানুষী খেলার জিনিস নিয়ে কেন সময় নষ্ট করছেন?

গ্ল্যাডষ্টোন সেদিন বিদ্যুতের যে-মহাসম্ভাবনার ভবিষ্যৎ চিত্র দেখতে পাননি, ফ্যারাডে পেয়েছিলেন। তাই তিনি সেদিন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীকে বলেছিলেন---My lord, there will soon come a day, when you will be able to tax it! ফ্যারেডের সেই ভবিষ্যৎ বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সফল হয়েছে।

দুই

গতবারে তোমাদের বলেছি, কেমন করে হঠাৎ বৈদ্যুতিক তত্ত্বের খবর মানুষ ধরতে পারল। আজ আমাদের দেশের হঠাৎ খুঁজে পাওয়া একটা বড় জিনিসের কথা বলব। ভারতীয় চিত্রকলা অর্থাৎ যে-ভাবে আমাদের দেশের প্রাচীনকালের বড় বড় চিত্রকররা ছবি আঁকতেন, তার বিষয় বোধ হয়, তোমরা কিছু-না-কিছু শুনে থাকবে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত জগতের অনেক লোকের ধারণা ছিল যে, আমরা ভারতবাসী, আমাদের অতীত-সম্বন্ধে যে সব ধারণা করি, সেগুলো কাল্পনিক। কিন্তু ধীরে ধীরে অনুসন্ধানের ফলে মাটীর ভেতর থেকে, পাহাড়ের গায়ে, গহ্বরে, হারিয়ে-যাওয়া পুঁথির পাতায় এমন সব প্রমাণ

বেরুতে লাগল, যাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়ে গেল যে, আমরা যে-সভ্যতার উত্তরাধিকারী, জগতে তার তুলনা ছিল না।

ছবি-আঁকার দিক দিয়ে আমাদের দেশের একটা বিশিষ্টতা ছিল এবং খুব প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশের চিত্রকররা অতুলন সব ছবি আঁকতেন। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত সেই সব ছবির অস্তিত্বের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়-নি। সেইজন্য কারুর বিশেষ ধারণা ছিল না, প্রাচীন চিত্রকররা কি-ভাবে আঁকতেন, তাঁদের ছবিতে তারা কি-ভাবে রঙ আর রেখা ব্যবহার করতেন, আর কেনই বা তাঁদের আঁকা ছবি অতুলনীয় ছিল।

পশ্চিম ভারতবর্ষের নিজাম রাজ্যের সীমান্তে অজন্তা বলে একটা নগণ্য গ্রাম ছিল। সেই নগণ্য গ্রামের এক পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে জগতের বিস্ময়কর এই সব ছবি পাহাড়ের এক গুহার ভেতর লুকিয়ে ছিল। অজন্তার সেই গুহার সন্ধান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন একদিকে ভারতের একটি অতীত কীর্তির সন্ধান পাওয়া গেল, তেমনি সেই সব অপূর্ব ছবি আমাদের দেশের বড় বড় চিত্রকরদের মন মুগ্ধ করল এবং তাঁরা বহুদিনের হারিয়ে যাওয়ার সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে এক নতুন ধরনের ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন। আমাদের দেশে ছবি-আঁকাতে একটা যুগান্তর দেখা দিল। কিন্তু এই অজন্তার সন্ধান পাওয়া গেল… একেবারে হঠাৎ!

১৮২৯ সালে একজন ইংরাজ সৈনিক একা অজন্তা গ্রামের জঙ্গলে বাঘ শীকার করতে আসেন। সারারাত্রি বনে ঘুরে ঘুরে বাঘের সন্ধান না পেয়ে লোকটি ক্লান্ত হয়ে পড়েন…তার ওপর আর এক বিপদ হ'ল… জঙ্গলের ভেতর পথ গেল হারিয়ে…সাহেবটির ধারণা হ'ল যে, তিনি ক্রমশ মানুষের বসবাস থেকে দূরে যেন জঙ্গলের মধ্যেই ঢুকে যাচ্ছেন।

এমন সময় হঠাৎ একটা ছোট্ট ছেলের গলার শব্দ শুনিতে পেলেন। একটা রাখাল বালক মেষ চরাচ্ছিল, তার শব্দ। সাহেবের মনে আশা হ'ল যে, তাহলে নিশ্চয় মানুষের ঘরবাড়ী আছে কাছেই।

রাখাল বালক দেখে, বন্দুক হাতে এক সাহেব শীকারের খোঁজে এসেছে। সেই ইঙ্গিত করে বল্লে, বাঘ খুঁজছ? আমি বাঘের বাসা দেখিয়ে দিতে পারি। তারপর সেই সাহেবকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গায় আঙ্গুল দেখিয়ে বললে, ঐখানে···ওর ভিতরে বাঘ আছে।

সাহেব জঙ্গলের ঘন গাছপালার মধ্যে চেয়ে হঠাৎ দেখেন, সূর্যের নিভে-যাওয়া আলোয় সোণালী রঙের একটা থাম ঝিকঝিক করছে। তাই দেখে হঠাৎ সাহেবটির মনে হ'ল নিশ্চয় কোন প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ হবে।

তারপর লোকজন ডেকে মশাল নিয়ে জঙ্গল কেটে সাহেব সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখেন, সত্যিই তো···গুহার ভেতরে অপূর্ব সব ছবি!

এইভাবে বাঘ খুঁজতে গিয়ে বেরুল, জগতের শিল্পভাণ্ডারের অদ্বিতীয় সব ছবি!

=তিন=

স্যাকেরিন কাকে বলে তোমরা নিশ্চয়ই জান, চিনির চেয়ে এই পদার্থটি তিন শ' গুণ মিষ্টি। গত মহাযুদ্ধের সময় বহু জায়গায় যখন চিনির অভাব পড়েছিল, তখন চিনির বদলে এই স্যাকেরিন ব্যবহার করা হ'ত।

তোমরা শুনলে হয়ত অবাক হয়ে যাবে যে, আলকাৎরা নিয়ে গবেষণা করতে হঠাৎ এই মধুর চেয়ে মিষ্টি জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায়!

ইরা রেমসেন ব'লে একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক আলকাৎরা নিয়ে গবেষণা করছিলেন।

একদিন ভয়ানক ক্ষুধার্ত হওয়ায় তিনি তাড়াতাড়ি হোটেলে এসে খেতে বসেন। কিন্তু খেতে আরম্ভ করতেই দেখেন, খাবার ভয়ানক মিষ্টি লাগছে…এত মিষ্টি যে, মুখে দেওয়া যায় না। যে খাবারই খেতে যান, সেই রকমই মিষ্টি লাগে। ক্ষিদের সময় রান্নার এই রকম বিভ্রাট দেখে, রেগে তিনি হোটেলের কর্তাকে ডেকে পাঠিয়ে ভৎর্সনা করতে লাগলেন।

সে বেচারী অবাক হ'য়ে গেল। এত অতিরিক্ত মিষ্টি তো কিছুতেই দেওয়া হয়-নি। আর রুটিই বা মিষ্টি লাগবে কেন? তাতে তো চিনি আদৌ দেওয়া হয়-নি।

সেদিন বৈজ্ঞানিকের আর খাওয়া হ'ল না। রেগে জল খেয়ে ওঠবার সময় হাতের আঙ্গুলটা মুখে লাগায় আঙ্গুলটা মিষ্টি লাগল? ব্যাপারখানা কি? আঙ্গুল চুষে দেখেন, সত্যিই তো আঙ্গুলে এত মিষ্টি এল কোথা থেকে? ভাল করে হাত ধুলেন কিন্তু তখনও মিষ্টতা যায় না।

হঠাৎ তাঁর মাথায় কি একটা কথা মনে হ'ল। তখুনি ছুটে তিনি ল্যাবরেটরীতে এলেন। যে সব জিনিস নিয়ে কাজ করছিলেন, প্রত্যেকটি সেই অবস্থায় তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করতে লাগলেন, এবং এই অনুসন্ধানের ফলেই তিনি স্যাকেরিনের অস্তিত্বের খবর পেলেন।

—(*)—

আর এক যুগের কিশোরদের কথা

সংস্কৃত ভাষায় "উপনিষৎ" বলে এক ধরণের বই দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন আর্য-ঋষিরা এই সব বই রচনা করে গিয়েছেন। এই বইগুলিতে আমরা দেখতে পাই, আমাদের দেশে পুরাকালে জ্ঞানী লোকেরা কি চিন্তা করতেন, তাঁদের কি ছিল সাধনা, এবং তাঁদের জীবন ছিল কতখানি উন্নত এবং উদার।

সেই বইগুলির মধ্যে কতকগুলি অপরূপ ছেলের কাহিনী আছে.... বহু যুগ আগের, আমাদেরই দেশের কয়েকজন কিশোরের কথা। আজকের যুগের কিশোর-কিশোরীদের কাছে, তাদের কাহিনী আজ বলছি।

—এক—

প্রথমেই বলি নচিকেতার কথা।

বাজশ্রবা ঋষির তপোবনে সেদিন ভারতের সমস্ত মুনি-ঋষি সমবেত হয়েছেন। ঋষি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেছেন। এ-যজ্ঞের নিয়ম হ'ল, যিনি যজ্ঞ করবেন, তাঁকে তাঁর যথাসর্বস্ব দান করতে হবে, নিজের ব'লে কিছুই রাখতে পারবেন না।

যজ্ঞ শেষ হয়ে গিয়েছে। বাজশ্রবা ঋষি একে একে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে দিলেন। যজ্ঞভূমির একধারে দাঁড়িয়ে বালক নচিকেতা সেই মহাদৃশ্য দেখছিলেন। নচিকেতা বাজশ্রবা ঋষির একমাত্র পুত্র।

দান শেষ হয়ে গেল। এবার পুরোহিতদের দক্ষিণা দেওয়ার পালা। দক্ষিণার জন্যে তখন মাত্র কতকগুলি শীর্ণ বৃদ্ধ গাভী অবশিষ্ট ছিল। বাজশ্রবা ঋষি সেইগুলিই দক্ষিণা-রূপে পুরোহিতদের দান করলেন।

বালক নচিকেতার মুখ বিষণ্ণ হয়ে এল। রুগ্ন-শীর্ণ গাভী, এই কি বিশ্বজিৎ যজ্ঞের দক্ষিণা ?

যখন বাজশ্রবা ঋষি একে একে অভ্যাগতদের বিদায় দিচ্ছেন, তখন বালক নচিকেতা পিতার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে পিতৃদেব, আপনি আমাকে দান করলেন কাকে ?

বালক-পুত্রের প্রশ্ন ঋষির কানে পৌঁছিল না।

নচিকেতার অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠল। ঋষি সর্বস্ব দান করে নিজের স্নেহের ধনকে সঞ্চয় করে রাখলেন। বিশ্বজিৎ যজ্ঞের ফল তিনি পাবেন কি করে ?

নচিকেতা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, পিতঃ, আপনার শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি আমি....আমাকে দান করলেন কাকে ?

ঋষির মনে সে চিন্তা ছিল না। তিনি তেমনি নিরুত্তর। বাইরের সর্বস্ব দিয়েও ঋষির মনে স্নেহের মায়া তাঁর অজ্ঞাতে প্রচ্ছন্ন রয়ে গেল। তিনি আপনার মনে একে একে অভ্যগতদের বিদায় দিচ্ছিলেন !

পিতাকে এবারও নিরুত্তর দেখে, নচিকেতা আবার একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন, পিতঃ, আমাকে দান করলেন কাকে ?

বিরক্ত হয়ে বিশ্বজিৎ-যজ্ঞকারী ঋষি ভৎ‍র্সনা করে বল্লেন, যমকে !

নচিকেতার মন আনন্দে ভরে উঠল। এতক্ষণে পিতার বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সার্থক হ'ল।

অভ্যাগতেরা সকলে একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। যজ্ঞের অগ্নি নিবে এল। ঋষির আশ্রম শূন্য করে দানসামগ্রী সব চলে গেল। ঋষি দেখেন, পুত্র নচিকেতাও তাদের সকলের সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত!

ঋষি ডাকলেন, কোথায় চলেছ, নচিকেতা ?

নচিকেতা পিতাকে প্রণাম করে বলেন, আপনার দানকে সার্থক করবার জন্যে।

—তার মানে?

—আপনি আমাকে যমের নিকট দান করেছেন। আমি এখন যমের সম্পত্তি। তাই তাঁর কাছে যাচ্ছি।

বালকের মুখে সেই স্থির-গম্ভীর কথা শুনে ঋষি বিস্ময়ে নির্বাক্!

—সে কি কথা নচিকেতা! আমি ক্রুদ্ধ অবস্থায় যা বলেছি, সেইটাই কি সত্যি হ'ল? পুত্রকে কে কবে যমের হাতে দান করে?

নচিকেতা বলেন, তা জানি না পিতঃ, তবে আপনি স্নেহের জন্যে কেন সত্যপালনে বিমুখ হবেন? ঋষির মুখ দিয়ে কখন মিথ্যা কথা বেরোয় না!

—কিন্তু এ কি করে সম্ভব হবে?

নচিকেতা বলেন, যে সংসারে জীবন শস্যের মত জেগে উঠে আবার পরিপক্ক হয়ে প্রতিনিয়ত ঝরে পড়ছে, সে-সংসারে মানুষের জন্যে কেউ সত্যপালনে বিমুখ হয়?

ঋষি বাজশ্রবা বুঝলেন, তিনি ঋষি বাজশ্রবা নন। তিনি পিতা বাজশ্রবা। যে-জ্ঞান তিনি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করে পাননি, বালক নচিকেতা কোথা থেকে সে-জ্ঞান পেল?

ঋষি আর কোন অনুনয় করতে পারলেন না। বালক নচিকেতা মৃত্যুলোকের পথে যাত্রা করলেন।

মৃত্যুর দ্বারে চলেছেন মর্তের শিশু!

যমলোকের দ্বারে এসে বালক নচিকেতা দেখেন দ্বার রুদ্ধ···যম ঘরে নেই। তিনি ছাড়া এ-দ্বার আর কেউ খুলে দিতে পারে না।

যমের অপেক্ষায় মৃত্যু-পুরীর দ্বারে বালক নচিকেতা দণ্ডায়মান রইলেন।

একদিন যায়, তু'দিন যায়, তিনদিন যায়।

তিনদিনের পর যম স্বলোকে ফিরে শুনলেন, দ্বারে এক অতিথি!

মৃত্যুশালার ইতিহাসে যা কখনও ঘটেনি, মৃত্যুর দ্বারে বিনা আহ্বানে অতিথি মানবশিশু, তিনদিন তাঁর অপেক্ষায় আছে, অন্নজল গ্রহণ না করে!

সাধারণ লোক আমরা। যমের নামেই ভয় পাই। কিন্তু যাঁরা উপনিষৎ লিখেছিলেন, তাঁরা বলেন, তিনি পরমসুন্দর নীলকান্ত পুরুষ। তিনদিন তাঁর দ্বারে অন্নজল গ্রহণ না করে অপেক্ষায় আছেন শুনে তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি তিনি মৃত্যুপুরীর দ্বার খুলে দেখেন, মৃত্যুর দ্বারে যেন শিশুসূর্য দ্বারী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

করজোড়ে মৃত্যু বললেন, হে মানবশিশু! জানি না কি উদ্দেশ্যে তুমি নিজে আমার দ্বারে এসেছ; তবে তিনদিন ধরে তুমি আমার দ্বারে উপবাসী হয়ে দাঁড়িয়ে আছ; আমার এ-অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। তুমি বর চাও! আমার তিনদিনের এই অপরাধের জন্য আমি তোমাকে তিনটি বর দেব! তুমি বল. কি কি বর তুমি নেবে?

নচিকেতার প্রথমে মনে পড়ল, পিতার কথা। অন্তরের একদিকে নচিকেতা তখনও শিশু। তাই নচিকেতা বলেন, আমাকে বর দিন, আমার পিতার মন থেকে আমার দরুণ উদ্বেগ দূর হোক! আমি যেন পিতার সম্মুখে আবার যেতে পারি, তিনি যেন তেমনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে গ্রহণ করতে পারেন!

যম বললেন, তথাস্তু। আমি যম, অসীম ঐশ্বর্যের অধিকারী। তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর। তুমি যা চাইবে, আমি তাই দেব।

নচিকেতা বললেন, আমি ঐশ্বর্য নিয়ে কি করব ? আপনি আমাকে সেই অভয়মন্ত্র শিক্ষা দিন, যে মন্ত্রের বলে মরণভীরু মানুষ ভয় জয় করে স্বর্গলোকে যেতে পারে !

যম বললেন, সে যে অতি দুরূহ মন্ত্র, অত্যন্ত জটিল !

নচিকেতা বললেন, আপনি বলুন, আমি তা অধিগত করব !

তখন মৃত্যু একে একে সেই জটিল সাধনার সব কথা বললেন। নচিকেতা তা শুনে তৎক্ষণাৎ যমকে সমস্ত শোনালেন।

যম বিমুগ্ধ ! নিজের গলার রত্নহার তিনি নচিকেতার গলায় পরিয়ে দিলেন। মানবশিশুর কণ্ঠে দোলে মৃত্যুর দেওয়া রত্নহার।

যম বললেন, নচিকেতা ! তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। যা চাও, রাজ্য, পৃথিবীর প্রভুত্ব, যা কিছু !

নচিকেতা বলে, তার চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ, সেই আত্মজ্ঞানের মন্ত্র আমাকে দিন !

বিমুগ্ধ যম বলেন, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাম্য তোমার আর কিছু নেই ?

নচিকেতা মৃত্যুকে প্রণাম করে বললেন, নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণুতে ! নচিকেতা তা ছাড়া অন্য কোন বর প্রার্থনা করে না !

যম নিজে মানবশিশুকে দেবতার দুর্লভ সেই আত্মজ্ঞানের মন্ত্র দিলেন। মানবশিশুর মহিমায় সেদিন মৃত্যু-দেবতার মন উদ্বেল হয়ে উঠল। তিনি নচিকেতাকে উদ্বুদ্ধ করে বললেন,

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত !

কিশোর-কুমার পৃথিবীতে সেদিন নিয়ে এল, মৃত্যুদেবতার আশীসবাণী —উত্তিষ্ঠত………

—দুই—

এবার বলি, ঋষি বরুণের পুত্র ভৃগুর কথা।

কিশোর ভৃগুর বেদ-পড়া শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু মনে শান্তি নেই!

'ব্রহ্ম কি? কে বলে দেবে আমাকে ব্রহ্ম কি? কিশোর ভৃগুর মনে জাগে এই পরম জিজ্ঞাসা।

ভৃগু পিতার কাছে উপস্থিত হলেন, পিতঃ, প্রশ্ন আছে।

—বল, ভৃগু! প্রশ্ন তোমার কি।

—আমি জানতে চাই, ব্রহ্ম কি?

ঋষি ভৃগুর মন উদ্বেল হয়ে উঠল। কিশোরের মনে একি জিজ্ঞাসা! পুত্রকে উপদেশ দিয়ে তিনি বল্লেন, বাছা, যাঁর থেকে জীবন আসছে, যাঁর জন্যে আমরা বেঁচে আছি এবং একদিন যাঁর মধ্যে আমরা যাব ফিরে, তিনিই হলেন ব্রহ্ম। তাঁকে তপস্যার দ্বারা তুমি জানতে প্রয়াসী হও।

ভৃগু তপস্যায় বসলেন। কঠিন তপস্যার পর তিনি জানলেন যে, অন্নই ব্রহ্ম। অন্ন থেকে জীবন আসছে, অন্নের জন্যেই আমরা বেঁচে আছি এবং অন্নেই আবার সব মিশিয়ে যাব!

কিন্তু ভৃগুর মনে শান্তি এল না! কে যেন তাঁর মনের মধ্যে বলে, ব্রহ্মের ওটা একটা বাহ্য রূপ মাত্র! তাঁর সম্পূর্ণ রূপ এ নয়।

ভৃগু আবার পিতার শরণাপন্ন হয়ে বললেন, পিতঃ, আমি তপস্যার দেখলাম, অন্নই ব্রহ্ম। কিন্তু তপস্যার শেষে তাতে আমার মনে শান্তি এল না! বলুন, ব্রহ্মের কি অন্য কোন রূপ আছে?

ঋষি বরুণ বলেন, হাঁ, আছে। তিনি শুধু অন্ন নন, তিনি প্রাণ, তপস্যাতেই তাঁকে জানা যায়!

ভৃগু আবার তপস্যায় বসলেন। বহু কঠোর তপস্যার পর তিনি জানলেন, প্রাণই ব্রহ্ম!

কিন্তু তাতেও তাঁর মন তৃপ্ত হ'ল না। তিনি আবার দুশ্চর তপস্যায় বসলেন; তখন বুঝলেন, জ্ঞানই ব্রহ্ম!

কিন্তু তবু মনে শান্তি নাই!

ভৃগু আবার তপস্যায় বসলেন। শেষ তপস্যা।

তপস্যা-শেষে দেখেন, তাঁর মনের ভেতর যেন শতসূর্য জেগে উঠেছে!

আনন্দে উদ্বেল হয়ে তিনি গেয়ে উঠলেন, পেয়েছি, পেয়েছি, আমি তাঁকে জানতে পেরেছি। তিনি আনন্দ। আনন্দে সকল জীবন জন্মাচ্ছে, আনন্দে সকল জীবন বেঁচে আছে, আনন্দেই আবার সকল জীবন লয় পাচ্ছে, ব্রহ্মই আনন্দ।

বালক ভৃগুর সেই অন্তরের জিজ্ঞাসা আজও মাঝে মাঝে পৃথিবীর চিত্তকে উদ্বেল করে তোলে।

—তিন—

ঋষি উদ্দালকের ছেলে শ্বেতকেতু।

ঋষির জ্ঞানের তুলনা নেই। কিন্তু তাঁর মনে চরম দুঃখ, তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুর জ্ঞানের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। পিতা পুত্রের মনে জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণে ব্রতী হলেন।

শ্বেতকেতুর উপনয়নের বয়স চলে যায়, তখনও সে খেলায় মত্ত। একদিন উদ্দালক ছেলেকে ভর্ৎসনা করে বললেন, যাও, তুমি আর ঘরে থাকতে পাবে না। কিশোর-কাল হ'ল অধ্যয়নের। তুমি গুরু গৃহে গিয়ে অধ্যয়ন করগে যাও।

শ্বেতকেতুর মনে কথাটা খুব লাগল। তিনি গৃহত্যাগ করে গুরুর আশ্রমে চলে গেলেন এবং বার বছরের মধ্যে বেদ মুখস্থ করে ফেললেন। যেদিন তিনি ঘর ছেড়ে চলে যান, সেদিন তিনি বার বছরের শিশু ছিলেন মাত্র ; তার বার বছর পরে তিনি ছয় বেদাঙ্গ সহ বেদ অধ্যয়ন শেষ করে বাড়ী ফিরে এলেন।

শ্বেতকেতু শিক্ষা শেষ করে বাড়ী ফিরে এলেন বটে, কিন্তু সমবয়সী কারও সঙ্গে কথা বলেন না। তাঁর ধারণা, তাঁর মত পণ্ডিত আর কেউ নেই। বিদ্যার অভিমানে তিনি সকলের উপর মাথা তুলে থাকতে চান।

উদ্দালক দেখলেন যে, পুত্র শ্বেতকেতুর সমস্ত শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। পুত্র শুধু বাইরের কয়েকখানি পুঁথি মুখস্থ করেছে, কিন্তু অন্তরে তাঁর কোন জ্ঞান হয় নি। তিনি স্থির করলেন, পুত্রের এ মোহ দূর করতে হবে।

একদিন তিনি পুত্র শ্বেতকেতুকে ডেকে বললেন, বৎস, তুমি গুরুগৃহ থেকে যা অধ্যয়ন করে এসেছ, আমি তার পরীক্ষা নেব। তোমাকে প্রথমে পনেরো দিন উপবাস করে থাকতে হবে। শুধু তৃষ্ণা পেলে জলপান করবে। ষোল দিনের দিন আমি পরীক্ষা নেব।

শ্বেতকেতু পনের দিন উপবাস করলেন। তাঁর দেহ, শীর্ণ-বিবর্ণ হয়ে এল। ষোল দিনের দিন উদ্দালক বললেন, ঋক্, সাম, অথর্ব এবং যজুর্বেদ তোমার কণ্ঠস্থ। একে একে তুমি আবৃত্তি কর, শুনি।

কিন্তু উপবাসে শ্বেতকেতুর দেহ ও মন এমন দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, তিনি অধিকাংশ শ্লোকই স্মরণ করতে পারলেন না। লজ্জায় তিনি দেখেন যে, অধিকাংশ শ্লোকই তাঁর মনে আসছে না।

ঋষিপুত্র লজ্জায় জিজ্ঞাসা করলেন পিতাকে, কেন এমন হ'ল ?

তখন উদ্দালক বললেন, একটা প্রকাণ্ড আগুনের যদি সবটাই নিবে যায়, থাকে মাত্র জোনাকির মত এক-কণা, তা দিয়ে তো কোন বড় কাজ সম্ভব নয়। আচ্ছা, এইবার তুমি অন্নজল গ্রহণ করে এস।

অন্নজল গ্রহণ করার পর শ্বেতকেতু দেখেন যে, ধীরে ধীরে আবার সব শ্লোক স্মরণে আসছে। তা হলে এই কটি অন্নের উপর নির্ভর করছে তাঁর মনের শক্তি।

উদ্দালক পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, অন্ন তুচ্ছ নয়! আমাদের প্রাণ হ'ল অন্নময়। সেই প্রাণ তুমি শ্বেতকেতু!

শ্বেতকেতু বিহ্বল হয়ে পিতার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, একি আপনি বলছেন?

—হাঁ, আমি ঠিক বলছি। সকল শিক্ষার সার হ'ল তিনটি কথা তৎ-ত্বম্-অসি…তুমি হলে সেই……

শ্বেতকেতু বিহ্বল হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এ আপনি কি বলছেন, পিতঃ?

উদ্দালক বললেন, তুমিই সেই, শ্বেতকেতু! প্রাণের মধ্যে তুমিই প্রাণ, জীবনের মধ্যে তুমিই জীবন! তোমার মধ্যে রয়েছে, এই প্রাণময় বিশ্বভুবন! তুমিই বিশ্বভুবন, শ্বেতকেতু!

আশ্রমের সামনে একটি বৃহৎ বটগাছ ছিল সেই বটগাছটি দেখিয়ে উদ্দালক বললেন, এই যে দেখছ গাছ, এর মূলে যদি একবার কুঠারের আঘাত কর, এ আহত হবে কিন্তু মরবে না। এর অণুতে অণুতে রয়েছে জীবনীশক্তি মিশিয়ে। সেই জীবনীশক্তির সঙ্গে আছে গাছের চৈতন্য, যার ফলে আহত হয়েও সে আবার নিজেকে বাঁচিয়ে তোলে। কিন্তু এই গাছ থেকে যদি একটা ডাল ভেঙ্গে ফেলে দাও, সে ডালটি শুকিয়ে মরে যাবে। ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের মধ্যে

রয়েছে সেই শক্তি, যাকে আমরা বলি জীবাত্মা, যাকে আমরা বলি ব্রহ্ম! শ্বেতকেতু, তুমিই সেই ব্রহ্ম!

শ্বেতকেতুর চোখের সামনে থেকে যেন কিসের পর্দা সরে গেল।

ঋষি উদ্দালক পুত্রকে ডেকে বললেন, ঐ গাছটির তলায় অনেক বটফল পড়ে আছে। তুমি একটা তুলে নিয়ে এস।

শ্বেতকেতু একটা বটফল নিয়ে এলেন।

উদ্দালক বললেন, ফলটি এবার ভাঙ্গ দেখি!

শ্বেতকেতু ফলটি ভেঙ্গে বললেন, ভেঙ্গেছি।

—কি দেখছ?

—অণুর মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজ।

—বীজগুলি থেকে বেছে নিয়ে একটি বীজ ভেঙ্গে ফেল।

—ভেঙ্গেছি।

আচ্ছা, এইবার কি দেখছ?

বিস্মিত হয়ে শ্বেতকেতু বলেন, হে ভগবান, কিছুই যে দেখতে পাচ্ছি না!

উদ্দালক বললেন, তুমি দেখতে পেলে না বটে, কিন্তু তোমার দৃষ্টিশক্তির বাহিরে ঐ বীজাণুর মধ্যে আছে প্রাণ-শক্তি···যা থেকে এই বিরাট বটবৃক্ষ।

পুত্রকে বিস্ময়ে বিমূঢ় দেখে, উদ্দালক বললেন, আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর। এই নাও একটু নুন। আজ রাত্রে এক পাত্র জলে এই নুনটুকু ফেলে রেখে দিও। কাল সকালে সেটা আবার আমার কাছে নিয়ে এসো।

পরদিন সকাল হতেই জলের পাত্র-হাতে শ্বেতকেতু পিতার নিকট উপস্থিত হলেন।

উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বললেন, কাল রাত্রিতে যে নুনটুকু জলের পাত্রে রেখেছিলে, সেটি তোল দেখি!

পাত্র-হাতে শ্বেতকেতু বললেন, অসম্ভব, লবণ-খণ্ড তো নেই, পিতঃ!

—আচ্ছা, ঐ পাত্রের ওপর-ভাগের জল একটু আস্বাদ কর। কেমন লাগছে?

—লবণাক্ত।

—ওর মধ্যভাগের জল একটু আস্বাদ কর। কেমন লাগছে?

—লবণাক্ত।

—ওর তলদেশের জল একটু আস্বাদ কর। কেমন লাগছে?

—লবণাক্ত।

—ঠিক এমনি ভাবেই এই সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে প্রাণ রয়েছে ছড়িয়ে, এমনি ভাবেই প্রাণশক্তির মধ্যে আমরা সকলে রয়েছি লীন হয়ে……শ্বেতকেতু, তুমি হলে সেই প্রাণশক্তি……তুমিই সেই তৎ-ত্বম্-অসি!

সেদিনকার সেই পিতাপুত্রের কথাপকথন আজও ভারতের সমস্ত শিক্ষার মূলে অমর হয়ে বেঁচে রয়েছে।

—(*)—

জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা কথা

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা ১—	লাইন ১০ ও ১২—		মরুতে>মেরুতে
পৃষ্ঠা ১—	লাইন ১৭ —	—	রইল>রইলেন
পৃষ্ঠা ২—	লাইন ১৬ —	—	এল>এলেন
পৃষ্ঠা ১৯—	লাইন ৯ —	—	আবিশ্বাসী>অবিশ্বাসী
পৃষ্ঠা ২০—	লাইন ১৯ —	—	বরার্ট>রবার্ট
পৃষ্ঠা ২৩—	লাইন ২১ —	—	জন্তদের>জন্তুদের
পৃষ্ঠা ৪৪—	লাইন ১৬ —	—	রাইল>মাইল
পৃষ্ঠা ৪৬—	লাইন ৮ —	—	২০লক্ষ>৩০ লক্ষ
পৃষ্ঠা ৪৮—	লাইন ৩ —	—	৮০ লক্ষ>৩০ লক্ষ
পৃষ্ঠা ৫৪—	লাইন ৯ —	—	আববেরা>আরবেরা
পৃষ্ঠা ৫৪—	লাইন ১৪ —	—	পাটুলিপুত্র>পাটলিপুত্র
পৃষ্ঠা ৬৩ —	লাইন ৪ —	—	অতুলন>অতুলনীয়
পৃষ্ঠা ৬৪—	লাইন ২২ —	—	আলকাৎরা>আলকাতরা
পৃষ্ঠা ৭০—	লাইন ২১ —	—	আশীষ বাণী>আশিস বাণী
পৃষ্ঠা ৭১—	লাইন ১ —	—	বরুণের>অরুণের
পৃষ্ঠা ৭৪—	লাইন ২১ —	—	মিশিয়ে>মিশে